মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

ডিসেম্বর, ২০২৫
অগ্রহায়ণ, ১৪৩২

সূচীপত্র

২৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫

শিবচেতন হোক জাগ্রত		৩
ব্রহ্মজ্ঞান ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে সুষম-সাম্য-সমন্বিত বিশ্বব্যবস্থা	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
উৎস	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৪
আজাদ হিন্দ ফৌজ অপরাজেয়	পার্থসারথি বসু	১৪
The Truth	Prof. (Dr.) R. P. Banerjee	২০

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

শিবচেতন হোক জাগ্রত

মানবিক বৈশিষ্ট জগৎ মাঝে হয়েছে বিস্তৃত। মানবিক সম্পদ সর্বদাই জগৎ বিকাশের জন্য হয়েছে ব্যাপৃত। মানুষের জগৎ, সমাজ এর দ্বারা এগিয়েছে বিপুল পরিমাণে। মানুষ এখন সর্বদাই তৎপর এগিয়ে যেতে, এগিয়ে চলবে। জগৎ মাঝে যে প্রভা এসেছে এখন তারই হবে উত্থান সার্বিকে। যে প্রাণ গড়ে উঠেছে জগতের এই বাতাবরণে এখন তারই সময় নবীন ভাবনার পাখায় ভর করে উড়ে চলা আর তারই পটভূমিতে বুঝে নেওয়া জগতের এই অনন্ত জীবন প্রবাহের তাৎপর্য কি? কোন বা সেই ভাবনার রথ যার রয়েছে আকাশের মাঝে পথ রচনা করে নিয়ে নভোমণ্ডলের কেন্দ্রের অভিমুখে করতে অভিযান। খুঁজে নিয়ে তারই সঙ্গে হবে প্রস্তুত জীবনের মেল বন্ধন। যে ভাবনার দল শুধুমাত্র মাটির গন্ধে হয়ে আকৃষ্ট ছিল ভূমি ছুঁয়ে তার এখন নিত্য বিকাশের অমৃতক্ষণ। চেতনার দীপ্তি এখন জগতের মাঝে করে নেবে নতুন করে নবীন অবস্থান। এখন জীবনের যা কিছু নতুন গড়নের আসবে ঐ ক্ষণ সে হয়ে উঠবে মূর্ত মানবের আহ্বানকে নবীন যোজনার মধ্য দিয়ে করে নেওয়া এক অনন্য পরিচয়ের আহ্বান। এরই এখন নতুন হয়ে উঠবার সুযোগ, নবীন ভাবনার পরশ করে গ্রাস হয়ে উঠবার পর্ব ঐ অনন্য তার দীপ্তি করে উন্মোচিত।

জীবন প্রদীপ গড়ে নিয়েছে নিজের আলোর মণ্ডলী। মানুষে মানুষে ঐ আলোর প্রবাহকে করে কেন্দ্রস্থ জীবনের নবীন ভাবে হয়ে ওঠা। যে ভাবদীপ্তি অন্ত পরের মাঝে স্থির মাত্রায় ভাবনার গামনাগমন যেন যেন স্বতদীপ্ত হয়ে জগৎ মাঝে গড়ে তুলেছে এক স্থির অচঞ্চল অনাবিল ভাবরাজি। এখন ভাবরাজি যারই রয়েছে বিকশিত বিস্তৃত হয়ে স্থির অচঞ্চল উপাধির সীমা পেরিয়ে এগিয়ে চলতে জীবন পরিগ্রহের জন্য। এমনই জীবন বিকাশ এই পরিমণ্ডলের মাঝে যারই হয়েছে এই জগৎ পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়ে হতে অনন্যতায় বিকৃত। জগৎময় যে ভাব বিকাশ ক্ষণ এখন তারই হয়ে উঠবে উন্মোচনের আগ্রহ। উন্মোচনহল হয়ে ওঠা এমনই যার অভ্যন্তরের সর্ব অন্ধকার পেরিয়ে আলোর প্রবাহে তার ওঠা এক আলোক প্রদীপ হয়ে।

দিনের রাতের যা কিছু আলো এসেছে হয়ে প্রাণের সংগ্রহ সবই সময়ের কর্পূরে যায় উড়ে। দিনের মাঝের কর্ম চাঞ্চল্য আর রাতের স্তিমিত চেতনের অবগুণ্ঠন সবই মিলেমিশে এক হয়ে যেন স্বচ্ছ বায়ুর হিন্দোলে এগিয়ে চলতে চায় এই চেতনের নিত্য অধিকারের সীমার মাঝে অচঞ্চল দৃঢ় স্থির অথচ অনন্ত গতির সম্ভাবনাকে হৃদয়ে ধারণ করে নিয়ে এগিয়ে চলার পথযোজনা করে জগতের সব সীমাকে করে অতিক্রম এগিয়ে যেতে। যা কিছু হয়েছে সম্ভব এপর্যন্ত জীবন ব্যাপ্ত চেতন প্রভা তার সবটাকে করেছে একান্ত আবেশে আবিষ্টন। স্থিতির হৃদয়ের ভাবদীপ্তি স্থিতির প্রাণপ্রবাহকে করে তুলেছে অনন্ত প্রভাময় এক একান্ত গতিষ্মান জীবন সম্পদ। এখন এই ক্ষণ যারই মধ্যে রয়েছে নিহিত জগৎ ব্যাপ্ত ঐ শক্তির পাখা মেলে এগিয়ে চলবার। এই ক্ষণ প্রভার দীপ্তি এখন জীবনের যা কিছু নিহিত উদ্দেশ্য যার যা কিছু রয়েছে ভাব বিকাশের পথ এখন সে সবেরই সময় আরও প্রসারিত হয়ে যাওয়া। নিত্য নিরঞ্জনের নিত্য আলোকপ্রভায় হয়ে ভাস্বর জীবন প্রদীপ দিয়েছে উপহার আলোর বলয়। এমন আলোক প্রভার রয়েছে আবাহনী আর বিকাশের ব্যাপ্তি। আবাহনির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে এই জীবনের নিজ বৃত্ত হয়ে চলবে সদাই প্রসারণশীল। ব্যাপ্তির মাঝে রয়েছে ক্ষুধা আর রয়েছে ক্ষুধা তৃপ্তির অঙ্গীকার। ক্ষুধার এই বহর যেন জীবনের নিত্যই এক এগিয়ে চলবার শক্তিকণার বীজ পরিচয়। ক্ষুধার রাজা দীপ্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐ ক্ষুধার তৃপ্তির আগ্রহকে করতে চায় ব্যাপ্ত।

জীবনের ক্ষুধার পর্ব হয়েছে জৈবনিক-মানসিক আর জাগতিক। জৈবনিক বা বায়োলজিক্যাল। এমনই ক্ষুধার মৌল রীতি সব প্রাণেরই মাঝে যেন হয়ে রয়েছে একাকার। এমন এক অনন্য একাকার হয়ে বিরাজ করা যার একাংশ হয়ে উঠতে পারে অনন্যতায় বিধৃত এক অনন্যচেতন প্রকাশ যার অন্তর-বাহির সবই হয়ে উঠবে ক্ষুধার দ্বারা আচ্ছন্ন। এক থেকে একাধিকে বা বহুতে ব্যাপ্ত হতে চাওয়ার সমপ্রসাদ মনের অঙ্গণে নিয়ে আসতে পারে ঐ অনন্য ভাব ধারার বিকাশ পক্ষকেই ধারণ করে সব ক্ষুধার আস্তরণ সরিয়ে দিয়ে আনন্দের অনন্যতায় ডুবে যাওয়া। জাগতিক এই জৈব ক্ষুধা শুধুমাত্র শক্তিবিনাস বা অনন্যভাব সঞ্চারকে গ্রহণ করবার আনন্দকে প্রকাশ চেতনে নিয়ে এসে ঐ প্রকাশ চেতনের সবকটি পটভূমির মধ্যেই সমন্বয়ী প্রভার অবতারণার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার প্রয়াস জগৎপথের সব সীমানায়। ক্ষুধা বিনাশ আনতে সক্ষম স্বল্প পরিসরে। ক্ষুধার ক্রমতৃপ্তী বিনাশক আহ্বান করে নিয়ে আসে স্থায়ী এক কালের পরিচয়ের মধ্যেই। জাগতিক ক্ষুধার ক্রম তৃপ্তির মধ্য দিয়ে ক্ষুধাতুর সব বিকাশময় জীবনকে আবাহন করে অনন্যতায় ভরিয়ে দিতে পারে ঐ ক্ষুধার ক্রম তৃপ্তি। ক্ষুধা যদি শুধুমাত্র হয়ে ওঠে ভাগবতী তবেই সে ক্ষুধার অস্তিত্বই ভাগবতী ভাবসঞ্চার ও ভাব বিকাশ হয়ে ওঠে। আর ক্ষুধার তৃপ্তি বাড়িয়ে দেয় ভক্তি, ভগবৎ প্রেম ফুটে ওঠে ভাগবতী ক্ষুধার ক্রম তৃপ্তির আর পরিণতির সঞ্চার পর্বে।

—ঃঃ—

ব্রহ্মজ্ঞান ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে সুষম-সাম্য-সমন্বিত বিশ্বব্যবস্থা

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাম রাজত্ব সম্ভব হয় যদি পাওয়া যায় শ্রীরামচন্দ্রকে। রাম বিনা রামরাজত্ব হবে কেমন করে। রাষ্ট্র, সমাজ বা কেন সংস্থা পরিচালনের জন্য চাই রাজা যিনি হবেন তেমনই চরিত্রের যে চরিত্র দেবসম। রাজা হবেন তেমন দিব্য চরিত্রের আর পালন করবেন হিতকারী ভূমিকা সর্বদাই। রাজা হবেন অন্যের জন্য হিতকারী। সংস্থা সমাজ বা রাষ্ট্রের যে কোন পর্যায়েই রাার এই হিতকারী ভূমিকা সব সময়ে থাকবে সচল। রাজার ব্যক্তিত্ব আর চরিত্রই প্রধান বিষয়। ব্যক্তিত্ব হতে হবে সর্বদাই ভাল পরিণাম নিয়ে আসবার জন্য সবার তরে। তেমনই সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য রাজার ভূমিকা হবে ভাল পরিনামী। এজন্য রাজার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে গড়ে তোলার দায় তার নিজের। এজন্য রাজাকে হতে হবে ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী। ভগবানের পথে অনুভব যিনি করেছেন তিনি ক্রমে এগিয়ে চলবেন; ঐরকম চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠতে পারবেন। সমাজ বা রাষ্ট্রের মাথায় যিনি বা যারা বসে আছেন বা বসবেন হতে হবে তাদের বেদবিদ্যায় পারঙ্গম। বেদবিদ্যার স্বভাব হল যে যিনি এই বিদ্যার পথে এগিয়েছেন তিনি পারেন অনুভব ও উপলব্ধি অর্জন করতে যার মাধ্যমে হয় তার চরিত্রের উন্মেষ। রাজার চরিত্র হতে হবে দেবসম। তিনি হবেন সদাই বাসনামুক্ত ও কামনামুক্ত। রাজার চরিত্র হবে স্বার্থপরতামুক্ত, হবেন তিনি সদাই নিবেদিত। রাজা অথবা প্রধান কর্তৃত্বের অধিকারী যদি কামনামুক্ত না হন তবে তার পক্ষে সবার দায় ও দায়িত্ব বহন করা সম্ভব হবে না রাজা স্বয়ং বাসনা-কামনার দ্বারা আক্রান্ত হলে তবে তার মধ্যে আসবে আবিলতা। তিনি তখন শাসক থেকে সরে এসে হয়ে ওঠেন শোষক। জনস্বার্থ সুরক্ষা, সমাজ-রাষ্ট্র সংস্থার স্বার্থ সুরক্ষা ও ঐ স্বার্থকে আরও শক্তিশালী করবার পরিবর্তে নিজের স্বার্থ অথবা নিজ বৃত্তের জন বা স্বজনদের স্বার্থ সুরক্ষার দিকে সদা নজর রেখে রাষ্ট্র, সমাজ বা সংস্থার চলবার গতিমুখ সর্বদা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির দিকে নিয়োজন করবেন। বেদবিদ্যার অভ্যাস আর বেদ চর্চা রাজাকে ক্রমশ কলুশবিহীন চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলে। প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের জীবন চলার মধ্যে যদি ভাগবতী জ্ঞানকণা করে প্রবেশ করে ঐ রাজার চরিত্র গড়ে তোলে অভ্যন্তর থেকেই। ভগবানকে বরণ করে দিয়ে ভগবানকে জীবনের অপরিহার্য করে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে রাজা স্বয়ং হয়ে ওঠবেন নিঃস্বার্থ এক চরিত্র যিনি, নিজের বা নিজবৃত্তের জনদের জন্য ধ্যান না দিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র বা সংস্থার সবার জন্য হয়ে উঠবেন নিত্য শুভপ্রদ, কল্যাণকারী ও কল্যাণকামী।

ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক সমাজই পৃথিবীতে মানব সভ্যতার আদি সাম্য সমাজ। এই সময়ের এবং পুরোপুরি বৈদিক সভ্যতার প্রায় দশহাজার বছর ধরেই ভারতবর্ষ পৃথিবীকে দিয়েছে একটি সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার। পরবর্তীকালে ও প্রাক্ আধুনিক যুগে তারা চিন্তা করেছেন কোনও রকমের সাম্যের ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে তারা বোঝেননি, আর কিঞ্চিৎ বুঝলেও কোনও কোন ক্ষেত্রে অবহেলা করেছেন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ছিল প্রাচীন বৈদিক সময়ে ভারতের জীবন বৈদিক দর্শনের ভিত্তিতে জীবন। ঐ সময়ের জীবন ছিল ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের ভিত্তিতে যখন হবে জীবন প্রতিষ্ঠিত জীবনের চলার পথের জন্য চাই ধর্মভিত্তিক সমাধান। ধর্ম অনুশাসনের মৌল আদর্শ হল শুভ সম্পাদন করা। যা কিছু সৎ, যা কিছু শুভ সবই হয়ে ওঠে বহুজনের জন্য শুভ সম্পাদনকারী। যা কিছু শুভকারী আর যা কিছু সৎ অভিসরী সে সবকেই বরণ করে নেওয়া যায় এই পটভূমিতেই। ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে যে সমাজ, রাষ্ট্র বা সংস্থা যে মেনে চলে সব শুভকারী পথ। ব্যবহার ও চরিত্র সম্পদ গড়ে ওঠে জীবনের এগিয়ে চলার পথে। যা কিছু সৎ, যা কিছু ভাল, যা কিছু নবীন হয়েও সদাই হয়ে ওঠে সুষম ও সুস্থ চিন্তার ক্ষেত্র সেটিই হয় ধর্মবোধে সদা প্রতিষ্ঠিত। ধর্মবোধ মানুষকে কোনও অন্যায় পথে যেতে দেয় না। অন্যায় পথে জীবন এগিয়ে চলতে গেলে ধর্মবোধ বিবেক হয়ে বাধা দেয় সে জীবনকে। তাই ধর্মবোধের ভিত্তি থাকলেই জীবন অন্যায়কারী হয় না — প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে। যা কিছু শুভ ধর্মবোধের উপর সেসব প্রতিষ্ঠিত।

দেবতার দিব্য আলোয় ঃ তা অন্য নমসা সহঃ সপর্যন্তি প্রচেতসঃ।
ব্রতানি অস্য সপ্রিরে পুরুনি পূর্বচিত্তয়ে।
বসবোঃ অনু স্বরাজ্যম্।। (ঋ. বে. ১/৮৪/১২)

ঐ চেতন রশ্মি এসেছে এখন জগৎ মাঝে স্বতঃই

আসুক জাগ্রত বিবেক হয়ে উন্মুক্ত তোমার জন্য।
জ্ঞানের প্রভা হোক মুক্ত জীবন মাঝে সদাই
হোক তোমার প্রকাশ জগৎময় জীবন ব্যাপী সর্বত্র।
এখন এসেছে জীবনের প্রকাশ পর্ব সবখানে।
জ্ঞানেরবিস্তার হোক জীবনের সবখানে সবসময়ে।
উঠুক জেগে সাধনার আগ্রহটি হয়েছে যদি শুরু
এখন আসুক সময় বিকাশের তোমার কৃপায়।।

তোমারই এই নিবেদনে ঃ ইন্দ্রঃ দধীচী অস্থিভিঃ।
বৃত্রাণি অপ্রতিষ্কুতঃ অপ্রতিষ্কুতঃ জঘান্ নবতীঃ নব।। (ঋ. বে. ১/৮৪/১৩)
ঋষির আলোর দীপ্তি পড়েছে ছড়িয়ে
যেমন করে এসেছে সময়ের স্রোতে
তোমার অনন্ত চেতন প্রবাহের হোক উন্মোচন
যে সত্য হয়েছিল প্রকট দেব ব্যবস্থায়
এখন সময় এসেছে সে দেব ব্যবস্থার বিকাশের
ছিল যা কিছু দেব ব্যবস্থার প্রতিবন্ধক
হোক তার নিত্য দিনের নিত্য বিমোচন দেব বিকাশে
শত বৃত্র রহনন যেমনে দেবরাজ করেছেন দেব প্রতিষ্ঠা।।

জীবনের দেবশক্তি ঃ ইচ্ছন্ অশ্বস্য যৎ শিরঃ।
পর্বতেষু অপশ্রিতম্। (ঋ. বে. ১/৮৪/১৪)
এই অন্তর রাজ্যে রেখেছি দৃষ্টি তোমার সন্ধানে
হয়েছে যেমন করে এক গতিময় সম্ভার।
দাও তোমার ঐ গতিময় প্রকাশ উন্মোচন
হোক এক নবীন প্রেরণার সঞ্চার এখানে
যেমন প্রভা এসেছিল ঐ প্রকাশ পর্বে
এখন হয়েছে ক্ষণ চলতে প্রেরণার পথে।
নিজ অন্তঃপুরে রয়েছে যে ভাবপ্রদীপ
জীবনের সকল আশ্রয় হয়েছে প্রসারিত গতিময়।।

দেবসত্যের বাহন ঃ অত্রাহ গোঃ অমন্বত নাম তুষ্টঃ অপীচ্যম্।
ইত্থ্যা। চন্দ্রমসো গৃহে।। (ঋ. বে. ১/৮৪/১৫)
যে প্রকাশ পরিচয় হয়েছিল প্রকট
হয়েছে সে প্রকাশ জীবনের নিবিড় প্রকারে
নিত্য গড়নে নিত্য প্রভায় হয়ে পাথেয়।
তোমার এই বহু প্রজ্ঞার প্রকাশ বৈচিত্রে
এখন ঐ বহু প্রজ্ঞা হোক বহু বিস্তার।
যে প্রকাশ স্বল্প প্রভায় হয়েছে দিপ্ত
হোক তার বহু বিস্তার দেব সত্যের হয়ে বাহন।।

ভারতের প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার ভিত্তি ছিল চতুবর্গ। সমাজের প্রতিষ্ঠাভূমি ছিল ধর্মবোধ। ধর্মই ছিল সমাজের বন্ধনী। ধর্মের লক্ষ্য ও অভিমুখ ছিল সর্বদাই ভগবান। ঋষিরা ছিলেন সমাজের কেন্দ্র পুরুষ। ঋষি ছিলেন সমাজের বিবেক ও সমাজের প্রজ্ঞা। মহাভারতের যুদ্ধ পরবর্তী যে ব্যবস্থা পত্তন করেন মহারাজ যুধিষ্ঠির সেটির অনুশাসনের প্রথা ছিল ধর্ম, ধর্মের অভিমুখ ঈশ্বর

লাভ। ধর্মভিত্তির সমাজ ব্যবস্থা তাই ঈশ্বর কেন্দ্রীক। মহাভারতের একটি শিক্ষা এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখের। এটি রাজর্ষি নহুশ, তার পুত্র যযাতি এবং যযাতিপুত্র পুরুরাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ। মহাভারতে ব্যাসদেব এই তিন পরম্পরার তিন রাজার বিষয় মোটামুটি বিস্তৃত বর্ণনায় জানিয়েছেন। মূল চরিত্রটি রাজা যযাতির। এর বাবা ছিলেন রাজর্ষি নহুশ। নহুশকে জনসাধারণ খুব শ্রদ্ধা করতেন, ঠিক ঋষির শ্রদ্ধা তিনি সদাই পেতেন।

যযাতির রাজশক্তির প্রভাব ছিল সর্বত্র বিদিত। যযাতি এমনিতে ছিলেন প্রজাহিতকর। তার ব্যক্তিত্বেরও ছিল খুব আকর্ষণী ক্ষমতা। ঋষির মুষমা মুণ্ডিত ও ঋষির গুণ সমন্বিত ছিলেন যযাতি। তিনি এমনিতেই ছিলেন খুব নিষ্ঠাবান, কর্তব্যনিষ্ঠ আর গুণনিষ্ঠ; কিন্তু ভগবৎ বিষয়ে তেমন আগ্রহ গড়ে ওঠেনি। যযাতি সর্বদাই ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ, ছিলেন ক্ষাত্রশক্তির অধিকারী প্রভূত মাত্রায়।

যযাতির বিবাহ হয় দৈত্যগুরু শুক্রচার্যের কন্যা দেবযানীর সঙ্গে। কিন্তু ঘটনার পরম্পরা ও পরিণতিতে দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গেও তিনি রত হন সম্পর্কে। এটি পৌঁছায় শুক্রাচার্যের কর্ণে। এই ঘটনার পরিণতিতে যযাতির ভাগ্যে আসে শুক্রাচার্যের অভিশাপ - হাজার বৎসরের জরাগ্রস্থ জীবন।

যযাতি অবশ্য এমন ক্ষমতাও পান যার ফলে নিজের জরাগ্রস্ত অবস্থা অন্যের অনুমতি সাপেক্ষে তাকে দিয়ে সুস্থাবস্থা নিজে ভোগ করতে পারেন। যযাতির মনে এই সময় উদয় যে অনন্ত বাসনার। সেই বাসনার তৃপ্তীর জন্য তিনি তার পুত্রদের কাছেই প্রস্তাব দেন তার জরাটি নিয়ে পরিবর্তে যুবক অবস্থা তাকে দিতে। কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই একমাত্র এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায়। যযাতির জরাগ্রস্ত অবস্থাটি প্রাপ্ত হয় পুত্র, পুরু আর পিতা, যযাতি এখন পেয়ে যায় যুবক অবস্থা। শুধু তাই নয়, এখন যুবক অবস্থায় যা কিছু ভোগের বিষয় হয়েছে সে সব উপযুক্তভাবে ভোগ সাধনের দ্বারা পুরোপুরি তৃপ্ত হবার জন্য বিপুল সামর্থ যযাতি পেয়ে যান। হাজার বছরের তারুণ্য পেয়ে গিয়ে যযাতি বিপুল শক্তি আর সম্পদ সংহত করে নিজের ভোগ বাসনমা চরিতার্থ করতে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ করলেন। এমনভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দী সমূহের কালব্যাপী বিপুল ভোগ উপকরণের মধ্য দিয়ে নিজের মনোমত তৃপ্তী খুঁজে চললেন যযাতি। একটি থেকে অন্য ভোগ উপকরণে ডুবে গেলেন তৃপ্তী পাওয়ার আশায়। নানা বরণে নানা ধরণে একটি থেকে অন্য ভোগকারী উপাদানের মধ্যে ডুবে গিয়েই যযাতি চেয়েছে তার ভোগের আকাঙ্ক্ষার সঠিক পরিতৃপ্তী।

হাজার বছরের তারুণ্য ও যুবক অবস্থার বলবতী হয়ে যযাতি জীবনের ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তীর জন্য যত উপায় হতে পারে সবই অবলম্বন করেছে। যযাতি জীবনের এই বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন নিজের কনিষ্ঠ পুত্রের সামর্থ্য শক্তি যুবক স্বভাব ও চরিত্রের ভোগশক্তি প্রাপ্ত হয়ে। মানব সভ্যতার অভ্যন্তরে যে মানব মনের ক্রিয়াশক্তি তার প্রকৃত চিত্রটি কেমন করে নিম্নগামী আকাঙ্ক্ষায় পিষ্ট হয়ে মানবের সমাজ ও সভ্যতাকে সর্বদা নিম্ন রুচি, নিম্ন স্বভাব, নিম্ন চরিত্রের বিন্যাসটি ধরা পড়েছে। যযাতির এই বিপুল অভিজ্ঞতার মধ্যে। যযাতি একদিকে বিপুল প্রভাবশালী একজন রাজা, এরই মাঝে অর্জন করেছে যুবকের সামর্থ ও শক্তি যা হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ও হাজার বছর ব্যাপী অক্ষত। এমন একটি পরিবেশ এবং চরিত্র মানব সমাজের ভোগস্পৃহার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি স্থানীয়। যযাতি তার সবরকম বাসনা পূর্ণ করবার সব সহযোগ ও ব্যবস্থার সাহায্যেই অফুরন্ত সব ভোগ উপকরণ পেয়েছেন নিজের অনায়াস অধিকারে; যেন জীবনের একমাত্র করে পেয়েছেন সব।

মন্ত্রের দীপ্তি এসে তুমি দিতে কো অদ্য যুঙ্কে ধুরি গা ঋতস্য।
দর্শন স্বীয় মহিমায় ঃ শিমীমতী ভামিনো দুই নায়ুন।
আসন দুষন্। ঋতসু অসৌ ময়োভুন্।
য এষাং ভৃত্যাম্ ঋনবৎ স জীবাৎ।। (ঋ বে. ১/৮৪/১৬)

এসেছ যদি দিতে দর্শন সম্মুখে এখন
তবে কেমনে করি ব্যাক্ত তোমারই মন্ত্র।
তোমারই শক্তি রয়েছে নিহিত তোমার মন্ত্রে
স্বয়ং যখনই হয়েছে মূর্ত কেন যাচি তোমার মন্ত্র।
স্বতঃই উৎসারিত রয়েছে যে মন্ত্র হয়েছে
শরবৎ নিগর্মন স্বতঃই অবারিতে সব সময়ে

তোমায় পেয়ে এখন হয়েছে প্রশান্ত এ হৃদয়
এসেছো হে পরম প্রিয় তুমি তোমারই স্বীয় মহিমায়।।

না চাইতেই এসেছ হে কৃপাময় ঃ

ক ঈষতে তুজ্যতে কো বিভায়।
কো মংসতে সন্তম্ ইন্দ্রং কো অন্তি।
কঃ তোকায় ক দভায়।
উত রায়ে অধি ব্রবৎ তনৈ কো জনায়।। (ঋ. বে. ১/৮৪/১৭)

তোমায় যদি চাই কেমনে তোমায় করি আহ্বান
কোন মন্ত্র রয়েছে গতি শ্রেষ্ঠ যা পারে করতে আকর্ষণ।
তোমারই চেতনার এই ঢেউ আসুক অন্তর মাঝে হয়ে দীপ্ত
দাও হে প্রাণের দেবতা তোমারই ঐ পরম প্রেরণা জীবনে।
এস হে দেবতা এই অন্তর মাঝে হয়ে স্বয়ং বাহিত
যা কিছু বাহন যন্ত্র অথবা হস্তি অশ্বের রথ।
রয়েছে মহাশূন্যে বিরাজমান দৃশ্যে বা অদৃশ্যে
পেয়েছি সে বাহন এখন তোমারই অধীনে এই দর্শনে।।

সূক্ষ্মে অন্তরে ঃ

কো অগ্নি হৃদয়ে।
হবিষা ঘৃতেন সুচা যজাতা। ঋতুভিঃ ধ্রুবেভিঃ।
কস্মৈ দেবা আ বহান্ আশু হোম।
কো মংসতে বীতিহোত্রঃ সুদেবঃ।। (ঋ. বে. ১/৮৪/১৮)

করেছে যদি আহ্বান কোনও ক্ষণ মাঝে
ঐ দিব্য চেতনের স্পর্শ দিতে জীবনের এই প্রবাহে।
দিয়েছ তাকে চেতনার পরশ দিয়েছ জাগরণের শক্তি।
দেবতার দীপ্তি হোক প্রকাশিত জীবনের এই পর্বে।
আসুক এখন দেবতায় বরণের ক্ষণ এই যাত্রায়
তোমার দেবচেতনের এই বার্তা হোক ব্যাপ্ত সর্বত্র হৃদয়ে।
যেমনে দিয়েছ এই উৎসর্গের প্রেরণায় তোমায় করতে বরণ
তেমন করেই পেয়েছি তোমায় চিত্ত মাঝে সুক্ষ্মে হৃদয়ে।।

নিত্য নিবেদনে ঃ

ত্বম্ অঙ্গ প্র সংসিষো।
দেবঃ শবিষ্ঠ। মর্ত্যম্।
ন ত্বৎ অন্যৌ মঘবন্ অস্তি মণ্ডিত।
ইন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ।। (ঋ. বে. ১/৮৪/১৯)

পার্থিব এই জীবন পরিবেশ পেয়েছে স্পন্দন
তোমার জগৎ বিস্তারের জগতের পথে পথে
হয়েছে যখনই চিত্ত মাঝে বিকাশ তোমার ভাব
পেয়েছি তোমায় একান্ত চিত্তে নিত্য নিবেদনে।
করেছি বরণ তোমায় হৃদয় রাজ রূপে অন্তরে।
এখন করি তোমায় নিত্য নিবেদন ভাব পথে।
যেমন করে এসেছে তোমার অনুভব জীবনে
হোক তার স্ফূর্তি সদা জাগ্রতে তোমায় বরণে।।

রাজা যযাতির পিতা রাজর্ষি নহুশ ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী যযাতির ছিল সব রকমের জাগতিক বিশিষ্ঠ; কিন্তু ছিল সব রকমের জাগতিক গুণের প্রাবল্য; কিন্তু ছিল এক বিরাট ঘাটতি। যযাতি ভাগবতী পথের ছিলেন না। তাই সহজেই তার মনের আর প্রাণের অঙ্গন দখল করে নিল বাসনা-কামনা, ভোগের জন্য লালসা। হাজার বছরের এই বাসনা-কামনার অবারিত উপভোগ যযাতির জীবনে নিয়ে আসতে পারত পরিতৃপ্তী কিন্তু তার জীবনে চলে এল তীব্র ধীক্কার। অফুরন্ত ভোগজীবন যাপনের পরে যযাতি তৃপ্ত হয়নি, সুখী হতে পারেনি। জীবনের সারসত্য অর্জন করলেন যযাতি। নিজের প্রিয় পুত্র পুরুষ সুন্দর যুবক অবস্থাটি নিজে নিয়ে, নিজেই অফুরন্ত ভোগজীবন যাপন আর নিজের কৃতকর্মের জন্য অর্জিত জরাগ্রস্ত অবস্থাটি পুরুর জীবনে দিয়ে দেবার ফলে এসে বিবেকের দংশন আর প্রবল ধীক্কার যযাতির জীবনে।

ন জাতু কামঃ কামনাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষ্যাঃ কৃষ্ণ বর্তম্ এব এবভূয়ঃ এব অভিবর্ধতে।। (মহাভারতম্ ১/৩৭/১২)

কাম্য বস্তুর বিপুলতম উপভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না; বরং ঘৃতের সংযোগ পেলে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে যেমন জ্বলবার ক্ষুধা বেড়ে গিয়ে অগ্নি আরও তীব্রতায় জ্বলতে থাকে, তেমনিই বাসনা কামনার ক্ষেত্রে কাম্যবস্তুর উপভোগে বাসনা ও কামনার বাড়বাড়ন্ত ঘটতে থাকে।

নিজের জীবনের এই দীর্ঘ কালপ্রবাহের অর্জিত যযাতি ব্যাক্ত করলেন পুত্র পুরুর কাছে। হাজার বছরের উদ্দাম ভোগজীবনের পর যযাতির অভিজ্ঞতা ব্যাক্ত হল একটি অনন্য উদাহরণ হিসাবে।

যৎ পৃথিব্যাঃ ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্য অপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ।। (মহাভারতম্ ১/৩৭/১৩)

পৃথিবীতে খাদ্যসম্পদ, ধনসম্পদ, পশু ও জীবসম্পদ, নারী রয়েছে সবই মিলিতভাবে একজনের ভোগাকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে না। সুতরাং ভোগের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

যযাতি বুঝলেন জীবনের এত দীর্ঘ কালের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে সৃষ্টির মাঝে মানুষের এক বিরাট সত্যকে উপলব্ধি করলেন তিনি। যে অভিজ্ঞতা একটি ব্যক্তি জীবনের অনুভব দিয়ে ধরা পড়েছে সেটি কোন বিশেষ একজনের জন্য নয়, এটি সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানব সভ্যতার জন্য এক চিরকালীন শাশ্বত সত্যেরই অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত।

যাঃ রদুঃ ত্যজা দুর্মতি অভিঃ যাঃ ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যঃ অসৌ প্রাণান্তিকো রোগঃ তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্।। (মহাভারতম্ ১/৩৭/১৪)

হীন বুদ্ধির কবলে পতিত ব্যক্তি সহজে কামনা ত্যাগ করতে পারে না, শরীর জীর্ণ হয়ে গেলেও কামনা জীর্ণ হয় না; এবং যে তৃষ্ণা প্রাণনাশক রোগস্বরূপ, সেই তৃষ্ণাকে যে ত্যাগ করতে পারে, তারই সুখ হয়।

হীন বুদ্ধিই মানমুষকে বাসনা-কামনার রাজ্যে নিয়ে যায়। প্রথমেই ঘটে বুদ্ধি নাশ ও বিবেক হানি। বুদ্ধিনাশ হলেই গড়ে ওঠে হীন বুদ্ধি হীন বুদ্ধি মানুষকে টেনে নিয়ে যায় নিচু প্রবৃত্তির দিকে। হীনবুদ্ধির কবলে যে ব্যক্তি পড়ে তারই মধ্যে গড়ে ওঠে বাসনা কামনার আকর্ষণ। বাসনা-কামনার জালে যে মন যায় জড়িয়ে তার সেখান থেকে বেরিয়ে আসা হয়ে ওঠে কঠিন। একটির পর একটি বাসনার জালে বন্দী হয়ে যায় সে জীবন। শরীর অপটু হয়ে গেলেও এমন হীনমন হীন রুচির কবলে যে মানুষ পড়ে তার বাসনা-কামনার দাসত্বের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। কামনা-বাসনার তৃষ্ণা সীমাহীন। এ তৃষ্ণা মেটে না যদি একবার মনের স্তরটি নেমে আসে। মনটি ভগবৎ আকর্ষণ বঞ্চিত হয়ে থাকলে তার এই ভাগবতী ভাববিহীন শূন্যতার মধ্যে ফুটে ওঠে বাসনা-কামনার আকর্ষণ। তাই হীনবুদ্ধির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে মনের মাঝে ভাগবতী ভাব ফুটে উঠবার ক্ষেত্র হয় প্রস্তুত।

হিতয়কারী কৃপা ঃ মা তে রাধাংসি মা ত উতয়ো।
বসৌ। অস্মান কদাচনা দভন্।
বিশ্বা চ ন উপমিহী। মানুষ।
বসুনি চর্ষনিভ্য আ।। (ঋ. বে. ১/৮৪/২০)
দিয়েছ জীবনের শক্তি জীবনের পথচলায়
দিয়েছ জ্ঞান সম্ভার চলতে এগিয়ে কালের পথে

দিয়েছ তোমার কৃপার পরশ সদাই উদার ভাবে
অনন্ত এই জীবন পথে তোমারই সকাশে হয়েছি স্থিত
পেয়েছি তোমার অফুরন্ত দান তোমার কাল প্রদীপে।
যেমনে হয়েছে সাধনের দীপ্তি যেমনে চেয়েছি তোমায়
দিয়েছ তেমনই ভাবপ্রদীপ করতে বরণ সদাই।
মানবের হিতকারী হোক তোমার এই কৃপার দান সদাই।।

ভাস্বর হোক প্রজ্ঞা ঃ

প্র যে শুম্ভন্তে জনয়ো ন সপ্তয়ো যামন্।
রুদ্রস্য সুনবঃ সুনং সমঃ।
রোদসী হি মরুত। চক্রিরে বৃধে।
মদন্তি বীরা বিদথেষু ধন্বয়ঃ।। (ঋ. বে. ১/৮৫/১)

করেছ সৃষ্টি ঐ দেবভূমি দেবতার তরে
আবার করেছ রচনা পার্থিব এই বিশ্ব মানবের তরে
জ্ঞানের আলো করেছ প্রসারিত জীবন মাঝে
হয়েছি সে আলোয় নিত্য স্নাত জগৎ চেতনে।
ঐ চেতন প্রজ্ঞা হয়েছে অগ্নিরূপী সংবেদ
জীবনের মাঝে দেবতার আহ্বান হয়েছে মূর্ত।
তোমার ঐ অসুর বিনাশী শক্তি হোক প্রবল
কর মোচন জগৎ পাত্র অদিব্য প্রভা করে হনন।।

দেবপ্রকাশ অন্তরে ঃ

ও উশ্রিতাসৌ মহিমানম্ আশৎ।
দিবি রুদ্রাসৌ অধি চক্রিরে সদঃ।
অর্চন্তৌ র্কং জনয়ন্ত ইন্দ্রিয়ম্।
অধি শ্রিয়ো দধিরে পৃষ্ণি মাতরঃ।। (ঋ. বে. ১/৮৫/২)

দেবরাজের এই রজবিস্তার এখন সদাই
হয়েছে সকল পরিচয়ের সীমা অতিক্রম
এখন তোমার দেবশক্তির বিস্তার করেছ সর্বত্র
উদার এই দৈবী প্রসাদ দিয়েছ উদার চেতনা
মানবের মাঝে হয়ে প্রসারিত জীবনের সম্পদ
যেমন করে এসেছে জীবনের সূচনায় আহ্বান।
তোমার ভজনার উৎসাহ দিয়েছ সদাই অন্তরে
দেবতার নিত্য নিরঞ্জন ঐ প্রকাশ হয়েছে অন্তরে।।

দেব আলোকময় ঃ

গোমাতরী যৎ শুভয়ন্তে অজ্জিভিঃ।
তনুষু শুভ্রা দধিরে বিরুক্মতঃ।
বাধন্তে বিশ্বম্ অভিমাতিনম্ অপ।
বর্ত্মানি এষাম্ অনু রীয়তে ঘৃতম্।। (ঋ. বে. ১/৮৫/৩)

আলোর কণায় হয়েছে স্নাত যে
পেয়েছে আরও গভীরে অন্তর প্রদেশে দৈবী প্রভা
পেয়েছে আরও গভীরে অন্তর প্রদেশে দৈবী প্রভা
তোমার আলোয় হোক ভরপুর এ জীবন সকল
তনুতে তনুতে অনুতে অনুতে হও তুমি প্রকাশময়।

হোক তোমার এই দীপ্ত আলোক জ্যোতিঃ সঞ্চারী
যেমন করে এসেছে বার্তা দেবলোক থেকে
তেমনই হোক জ্যোতির্ময় সকলে হয়ে দিব্য অভিসারী।
দেব আলোক পথ হোক এখন জগতে ভাস্বর।।

বিষয়তৃষ্ণা অনন্ত। বিষয় তৃষ্ণার কবলে যে ব্যক্তি পড়ে তার সেখান থেকে চলে আসা সম্ভব হয় না।

যযাতি ছিলেন বিশাল দেশের অধিবাসী ও অধিপতী। যযাতির ছিল রাজা হওয়ার প্রচলিত সব গুণ। বাস্তব জ্ঞান বাস্তব বিদ্যার প্রভূত অধিকারী ছিলেন যযাতি। ভগবৎ পথ তাকে আকর্ষণ করেনি। যযাতি চরিত্রে ঢুকে পড়েছিল কামনার ঝলক। কামনার এক ঝলকই যযাতিকে বিশাল কামনার পাহাড়ে আবদ্ধ করে রেখেছিল। যযাতি পেয়েছিল অবারিত কামনার ঢেউ। পুত্র পুরুষ কাছে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় যযাতি ঐ পর্বে তার মনের ভিতর কেমন করে একের পর এক কামনার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল সেটি বললেন ঃ—

পূর্ণ বর্ষ সহস্রং মে বিষয়ঃ আসক্ত চেতন।
তথা অপি অনুদিনং তৃষ্ণা মম ইতিস্ব অভিজায়তে। (মহাভারতম্ ১/৩৭/১৫)

আমি হাজার বছর ধরে বিষয় আসক্ত হয়ে বিষয়ের মধ্যেই মজে ছিলাম।

তৎ সত্ত্বেও আমার মধ্যে অবিরত নতুন নতুন কামনা-বাসনার সঞ্চার হয়েছে।

যযাতির এই অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে কৌটিল্য। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য রাজা চরিত্র বিন্যাস করেছেন কামনা-বাসনার প্রভাব মুক্ত রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের পত্তনের প্রয়াস থেকে। কৌটিল্যও চেয়েছেন রাজা হবে নির্মোহ চরিত্রের ত্যাগী ও চরিত্রবান হতে হবে রাজাকে।

রাজ্ঞৌ হি ব্রতম্ উত্থানম যজ্ঞঃ কার্যঃ অনুশাসনম্।
দক্ষিণাবৃত্তিঃ সাম্যং তু দীক্ষা তস্য অভিসেচনম্।। (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ১/১৯/৩৩)

রাজা ব্রত পালনের মাধ্যমে বিশেষ ও বিশাল হয়ে ওঠে। রাজার রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের ভিত্তি হল ত্যাগ। আর রাজার রাজকোষে অর্থাগমের লক্ষ হল সাম্য প্রতিষ্ঠা। রাজা সবার প্রতি সমান দৃষ্টি জ্ঞাপন করবেন।

আর্থ ব্যবস্থায় সাম্য স্থাপন করবার তত্ত্ব এবং উদ্যোগ মানব সভ্যতায় প্রথম কারণ কৌটিল্য। কৌটিল্যই প্রথম বিশ্বব্যবস্থায় একটি সাম্য ও সুষম রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার প্রস্তাবনা দিয়েছেন। এই ব্যবস্থাটি সম্ভব একমাত্র সেসব মানুষদের দ্বারা যারা ভগবৎ পথের, সত্যের পথে স্থিত শুধুমাত্র নয়; যারা বাস্তব জীবনেই ভগবানকে বরণ করে নিয়েই জীবন পথে চলেছে এগিয়ে। নিত্যদিনের কর্মপথের মাঝে যে খুঁজে পেয়েছে পথের রাজা, ভগবানকে, যে করেছে তাঁকে নিত্য দিনের জীবনের রাজা, জীবনের প্রধান ও একমাত্র আশ্রয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞান পুষ্ট ব্যক্তিই একমাত্র এ সাম্য সমাজ ও সাম্য অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে পারে। এই মানুষটি ব্রহ্মজ্ঞান পথিক। এমন ব্রহ্মজ্ঞান পথিকদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে সেই সোনার মানুষটি যে একেবারেই ব্রহ্মভাবে নিমর্জ্জিত। ভগবানকে ছাড়া যে মানুষ অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না। যার কোনও রূপ আকাঙ্ক্ষা নেই, নেই কোনও কামনা-বাসনা। বিষয়, সম্পদ, সুখ প্রভৃতির কিছুই যার চাওয়া নেই। যে চায় না কোনও কিছু নিজের জন্য, যার নেই কোন বাসনা, যে নির্মোহ। যে ব্যক্তি নিজেকে সঁপে দিয়েছে ভগবানের চরণে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই পারে সমাজ ও রাষ্ট্রের সঠিক পরিচালন করতে। ধর্মকে 'আফিঙ' এর সমান যাদের দৃষ্টিতে তাদের না আছে বা ছিল ধর্ম ও অধ্যাত্ম সম্পর্কে কোনও বোধ ও জ্ঞান, না ছিল ভারতের প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার ও তার বাণী নির্যাস সম্পর্কে কোনও ধারণা। অন্ধত্বই সমাজকে গ্রাস করে তাড়াতাড়ি। একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের ক্ষমতার কেন্দ্রে বসিয়ে দিলেই কোনও সমাধান হয় না। এই মানুষগুলোও হয়ে ওঠে জল্লাদ, শোষক, অত্যাচারী শাসক, পররাষ্ট্রগ্রাসী, একনায়করূপী দৈত্য। ইতিহাসের শিক্ষায় দেখা যায় ভগবৎ পথের পথিক, ব্রহ্মজ্ঞান পথের পথিক ব্যতীত অন্য যে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণী তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থ ছাড়া জনসাধারণের হিতসাধন পারে না।

নবীন মন্ত্রে ঃ

বি যে ভ্রাজন্তে সুমখাস ঋষ্টিভিঃ।
প্রত্যাবয়ন্তো অচ্যুতা চিদীজমা।
অনোজুবা যন্মরুতো রথেষু আ।
বৃষব্রতাসঃ। দৃষতীঃ অয়ুসধ্বম্।। (ঋ. বে. ১/৮৫/৪)

সাধন পথে হোক প্রস্তুত এক নবীন মন্ত্র
মন্ত্রের সাধন করবে প্রস্তুত বিজয়ের মন্ত্র।
তোমায় করেছে যে হৃদয় আহ্বান জীবনের পর্বে
হয়েছে তার প্রাণশক্তি ভরপুর দেবশক্তির দীপ্তিতে।
আলোর মালা এসেছে জীবনের পর্বে পর্বে দিয়ে প্রভা
দিব্য জ্যোতির্ময় এক জ্ঞানের প্রবাহ এসেছে জীবন মাঝে।
তোমার সকঙ্গ যে পেয়েছে হয়েছে সে আলোকে দীপ্ত।
এখন কর তোমার নিত্য সাথী জীবনের এই বিজয় রথে।।

জীবনের নিত্য প্রবাহে ঃ

প্র যৎ রথেষু পৃষতীঃ অয়ুগধ্বং।
বাজে। অদ্রিং মরুতৌ রঙ হয়ন্ত।
উত ঐরুষস্য বিষ্যন্তি ধারাঃ।
চর্মের উদভিঃ বি উদন্তি ভূম। (ঋ. বে. ১/৮৫/৫)

জীবনের এই উত্তরণের ক্ষণে হয়েছে নতুন যোজনা
যেমনে এসেছে জলের ধারা ঝর্ণার পথে
হয়েছে যেমনে বায়ুর সঞ্চালনে অনর্গল ধারায়
প্রবাহিত হয় যেমনে জীবনের সব ভাবনার ধারা।
এখন দেবতার দেওয়া অবারিত দানে ভরেছে জীবন
সাধনের সব পর্বেই এসেছে তোমার পরশ সদাই।
বায়ুর প্রবাহে এসেছে প্রাণের পরশ মহাপ্রাণ থেকেই
তোমার উপলব্ধির এই নিত্য প্রবাহ চলুক জীবনের সদা চলনে।।

দেবত্বে বিস্তর ঃ

আ বো বহন্তু সপ্তয়ো রঘুষ্যদো।
রঘু পত্বান্ প্র জিগাৎ বাহুভিঃ।
সীদতা বহিঃ উরু বঃ সদঃ কৃতং।
মাধয়ধ্বং মরুতো মধ্বো অন্ধমঃ।। (ঋ. বে. ১/৮৫/৬)

তোমার চেতনের পরশ নিয়ে হয়েছে গতিময়
যা কিছু হয়েছে অভীপ্সার রথ এ পর্যন্ত
তোমায় নিয়ে চলেছি এগিয়ে জগতের প্রান্তরে
সেই তোমায় করতে বরণ সর্বময় জিজ্ঞাসার প্রদীপ।
হৃদয়ের মাঝে করেছি বরণ তোমায় সদাই
যেমন করে এসেছে জীবন মাঝে তোমার আহ্বান।
যখনই হয় অনুভবের সূচনা করি আলিঙ্গন।
তোমায় নিয়ে সদাই চলেছি এই জীবন পথে নিত্য রথে।।

বিষ্ণু প্রসাদে ঃ

তে অবধন্ত স্বতবসৌ।
মহিত্বনা নাকং তস্থুঃ উরু চক্রিরে সদঃ।
বিষ্ণুঃ যৎ আবদন বৃষনং মৎ চ্যুতং।
বয়ো ন সীদন্ অধি বর্হিষি প্রিয়ে।। (ঋ. বে. ১/৮৫/৭)

তোমর দেওয়া শক্তির প্রকাশ হয়েছে জগতে
ভূমির প্রসাদ পেয়েছি যা কিছু এসেছে সেখানে

তোমারই ভাবকণা করতে প্রকাশ সদাই।
হোক তোমার প্রসাদ জগতের জন্য উদার দাতা
এমন করে হয়েছে যে প্রবাহ সদাই তোমার পরশে।
অন্তর মাঝে আছে ঐ দেবচেতন প্রদীপ হয়ে মূর্ত।
তোমার মহত্ব হোক বিস্তৃত সদা প্রকাশ পথে
দাও তোমার কৃপার সীমা করে প্রসারণ জীবনে।।

সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সুষম সাম্যাবস্থা প্রস্তুত করতে হলে চাই সব মানুষের সহযোগ ও অংশগ্রহণ। 'পার্টিসিপেশন ইন দি ইকোনমিক প্রসেস' বা আর্থ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ সাম্যাবস্থার প্রধান সোপান। প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক অর্থনীতির বিকাশভূমি সব মানুষ অথবা প্রায় সব মানুষের অংশগ্রহণ ও সহযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিকাশভূমিটি যতই হয়ে উঠবে সার্বিক ততই হবে নিবিড় আর্থ বিকাশ। বহু মানুষ বা সব মানুষের জন্য যা কিছু শুভ তারই বিকাশ পর্ব নিশ্চিত হয়ে উঠবে এই আর্থ ব্যবস্থায়। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য এজন্যই জোর দিয়েছেন উৎপাদনী শক্তির উপর। এই উৎপাদনী শক্তির কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। ভারতের অধ্যাত্ম আর্থ ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি মানুষ। মানুষ যদি সত্যি করে তৈরী হয় তবে সেই মানুষটি সমাজ রাষ্ট্র অথবা বিশ্বের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হয়ে উঠতে পারবে। আধুনিক ব্যবস্থাদি এজন্য শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দিয়েছে। শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে ছাত্রদের মধ্য দিয়ে জাতীয় বা অঞ্চল ভিত্তিক চেতনার প্রসার ঘটবে এমন বিশ্বাস নিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করছে।

'National and subnational learning assessments provide system level insights that classroom assessments by teachers cannot. to guide an education system, policy makers need to understand whethr students are mastering the national curriculum, in which areas students are stronger or weaker, Whether certain population groups are lagging behind and by how much, and which factors one associated with better student achievement.'

(Learning the Realise Education's promise, World Bank Report 2018, The World Bank, p. 18.)

শিক্ষা প্রকৃতভাবে সম্পাদন হল কিনা এজন্য জাতীয় বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষার প্রসার কার্যটিকে তদারকী করতে হয়। শিক্ষক তার পড়ানোর সময়ে ছাত্রদের যে বিদ্যা শিক্ষার পরিমাপ করে থাকেন এই পরিমাপটি সম্পূর্ণ হয় না। জাতীয় অথবা আঞ্চলিক মাপকাঠিতে দেখতে হবে জাতীয় প্রত্যয় অনুসারে ছাত্রদের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে কিনা শিক্ষা ব্যবস্থা। দেখতে হবে বেশি পারদর্শী ছাত্ররা যখন অন্যদের তুলনায় এগিয়ে চলেছে তখন অন্যরা কেমন করে পূরণ করবেন তাদের আরও বেশি করে পারদর্শী হওয়ার প্রেরণা ও আশা।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি বাহ্য কেন্দ্রীক। বাইরে থেকে ভিতরে আহ্বান করে নিয়ে আসা এই ব্যবস্থা। এজন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা বেশি করে তথ্যভিত্তিকও অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্ব ভিত্তিক হয়ে উঠছে। তথ্য ভিত্তিক হওয়ার ফলে এই ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে যে সব উপাদান তার প্রায় সবই বাহ্য কেন্দ্রীক। বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিল্প কলা সবই এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকেই উত্থিত। এরই ভিত্তিতে অর্থ ও কর্ম সংস্থানের জন্য যে প্রতিযোগিতা ফুটে উঠেছে বিশ্বব্যাপী সর্বত্র সেখানে নিত্যই এরকম ভাববিকাশী হয়ে থাকার সামগ্রিক প্রবণতাই এসেছে ছাত্র যুবক ও অন্যান্যদের মধ্যে। বিশ্ব সংস্থাগুলি শিক্ষার পরিমাপ করতে গিয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক ভাবাদর্শের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে কিছুটা হলেও। এজন্যই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে জীবনে ধারণ ও বরণ করে নেবার প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে খুঁজে নিয়েছে নিত্য সংযোজন নিত্যদিন এগিয়ে চলার প্রয়াস, নিত্যদিনের কর্মপথে জগতের কোনও ক্ষেত্রে কোনও রূপ বিজয়ের জন্য। প্রতিযোগিতায় বিজয় হয় অল্পজনের আর পরাজয় হয় বহু জনের। জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা। সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই প্রবণতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে নিত্য বিকাশধারা। কম বেশি এই বিকাশ ধারাই বিশ্ব ব্যবস্থার বন্ধনী। কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থা, এই বিশ্ব ব্যবস্থা পারেনি বন্ধ করতে বুভুক্ষা, দারিদ্র, বৈষম্য, সংঘাত, হতাশা, বিশাদ, মানসিক দৈন্য, নিম্নগামিনতা, পাশবিক প্রবৃত্তি বিদ্বেষ, ঘৃণা, লোভ, মোহ প্রভৃতি; পারেনি প্রতিষ্ঠা করতে প্রশান্ত, সুষম সমাজ ও সভ্যতা।

দেবতার এই প্রকাশে ঃ শুরা ইবেদ যুযুধয়ো ন জগ্ময়ঃ।
শ্রবম্যবো ন পূতনাসো যে তিরে।
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা মরুদভ্যৌ।
রাজান্ ইব ত্বেষ সংদৃশো নরঃ।। (ঋ. বে. ১/৮৫/৮)
প্রেরণার ধারা এসেছে মানবের জীবন মাঝে
যে সংগ্রাম পর্বে এসেছে জীবনের আগ্রহ।
রাজ বৃত্তে হোক জীবনের নতুন স্ফূর্তি
হোক নবীন প্রভায় প্রভাবিত সব চেতন ধারা।
দেবপ্রকাশ হয়েছে যা কিছু জীবনের উন্মেষে
জীবন দেবতা হোক সদা প্রসন্ন সময়ের প্রদীপে।
যেমন করে এসেছে জগৎ মাঝে তোমার পরশ
হয়েছে তেমন করে সবার তরে নিত্য প্রকাশে।।

অমৃত চেতনে ঃ ত্বষ্টা যদ্ বজ্রং সুকৃতং।
হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টং। সু অপা।
অবর্তয়ৎ। ধন্ত ইন্দ্রঃ নর অপাংসি কর্তবে।
অহন্ বৃত্রং নিঃ অপাম্ তৌ ব্যজৎ অর্নবম্।। (ঋ. বে. ১/৮৫/৯)
হয়েছে যে কর্ম পরিচয় এই জীবনের এখন
জ্যোতির্ময় সুকর্ণ ঐ রথের আবহ দিয়েছে যেমনে।
আলোর দেবতা এসেছে যে আলোর প্রদীপ
হোক সে শিখাময় জীবনের প্রকাশ পর্বে সদা সঞ্চারে।
এখন আসুক বার্তা করতে বরণ তোমায় নিত্যভাবে।
দেবতার এই রাজবৃত্ত দিক জীবনের জাগরণ মন্ত্র।
যেমন করে হয়েছে সে মন্ত্রের উন্মেষ পর্বে
আসুক শ্রবণ পর্বে তোমার অমৃত বার্তা।
যখনই হয় প্রক্ষিপ্ত তোমার চেতন জগৎ মাঝে।।

সুষম-সাম্য সমাজ গড়তে হলে চাই তেমন মনবিক পরিকাঠামো। জড় পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, বিজ্ঞানের প্রয়োগ, সামগ্রিক বিকাশ সবই সম্ভব হয় যদি উপযুক্ত মানবিক স্তরের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। সুষম-সাম্য একটি সামগ্রিক তত্ত্ব। ভারতবর্ষের বৈদিক আর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা হয়েছে ব্যক্তির উপরেই। ব্যক্তিকে হতে হবে ত্যাগব্রতী। রাষ্ট্র বা সমাজের সবার উত্থানের জন্য রাজা বা নেতৃত্ব বিনিয়োগ করবেন তার সবটুকু শক্তি ও সামর্থ। রাজা বা নেতৃত্ব কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থ, কোন শ্রেণীস্বার্থ অথবা কোনও গোষ্ঠী স্বার্থের কারাগারে বন্দী থাকবে না। রাজা বা নেতৃত্ব হয়ে উঠবে উদার ব্যাপক — সবার কাছেই গ্রহণীয়, বেশিরভাগেরই আদরের। এই ব্যবস্থাটি ভিত্তিমূলে থাকবে ঐতিহ্য ও সভ্যতার মধ্যে যা কিছু সদ্‌গুণ রয়েছে সেগুলি। আর্থ ব্যবস্থাটি হবে অধ্যাত্ম ভিত্তির। সব মানুষই পারবে অধ্যাত্ম জাগরণের পথে, আত্মজ্ঞান লাভের পথে এগিয়ে যেতে। রাজা বা নেতৃত্ব গড়ে তুলবেন একটি প্রেরণার বাতাবরণ যার মধ্য দিয়ে সকলে এই বিশ্বাসে পৌঁছতে পারবে মানুষজন। সবার মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে রাজা বা নেতৃত্ব প্রয়াস করবেন মানুষের মধ্যেকার ঐ সুপ্ত সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে। রাজা বা নেতৃত্ব জানবেন মানবের অন্তর মাঝে রয়েছে দেবত্বের অধিষ্ঠান — তাকে জাগ্রত করতে হবে এমনভাবে যার ফলে ঐ সুপ্ত সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে পরিণত হবে প্রয়াস ও কর্মে। এইসব প্রয়াস ও কর্মই আনবে আর্থ ব্যবস্থার মাঝে জোয়ার। এসবের মৌল প্রেরণা আসতে হবে রাজার মৌল চরিত্র বিকাশ থেকে। এই রাজাই রামরাজার সমান গুণের হতে পারবেন প্রয়াসের দ্বারা। ব্রহ্মজ্ঞানী নির্মোহ, ত্যাগী, নিতেন্দ্রিয়, সত্যময়, সত্যপথের অধিকরী এই রাজাই পারবেন ভাগবতী তত্ত্বকে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ ও সভ্যতায় একটি সুষম-সাম্য-সমন্বিত সমাজ ও বিশ্বব্যবস্থা গড়তে। হয়ে উঠুক রামময় রামরাজত্বের বিশ্ব প্রসার।

—ঃঃ—

উৎস

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

এই পৃথিবী আমাদের এই ধরা
তা' কী সত্যিই অধরা
এই জন্ম জীবন আর এই মৃত্যু
জীবনচক্র আর জটিল ঘূর্ণাবর্ত—
আগুনে সম্যক আহুতি আর
তাতে সৃষ্টি হয় যজ্ঞধূমের
সহস্র আবর্তে ধূম্রজালের
গমন আদিত্যে
সেখান থেকেই মেঘ
মেঘ থেকে জলবিন্দুর সমন্বয়ে বৃষ্টি
তির্যক নিরালম্ব বৃষ্টিধারা নেমে আসে মাটিতে
মৃত্তিকার সংযোগে ঘটে অঙ্কুরোদ্গম
সূর্যের আলোয় প্রকৃত পরিবেশে চারাগাছ
থেকে গাছ গাছগাছালি বৃক্ষ আর
শস্যদানা যা জীবজগতের তাবৎ প্রাণীর অন্ন
এক একটি প্রাণের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্পন্দন
যজ্ঞই বিষ্ণু যজ্ঞই ঈশ্বর
সবেতেই সেই মুক্ত পরমাত্মা।
এসো আমরা সেই দিব্য জ্যোতির
উপাসক হই
এসো আমরা ঈশ্বর প্রবর্তিত পথের
অনুগামী হই
তাঁরই দিব্য আলোয় সমৃদ্ধ হই।

—ঃঃ—

আজাদ হিন্দ ফৌজ অপরাজেয়

পার্থসারথি বসু

In this unprecedented crisis in our history. I hope only one word to say. Do not be depressed at our temporary failure. Be of good cheer and keep up your sprit above all, never for a moment falter on your faith in India's destiny, There is no power on earth that only keep India enslaved. India shall be free and before long.

– Netaji Subhas Ch. Bose's messess to Indian people.

আধুনিক যুদ্ধে কৌশলগত কারণে মাঝে মাঝে পশ্চাদসরণ করতে হয়, সাময়িকভাবে। 2nd World War's সোভিয়েট রাশিয়া হিটলারকে বিভ্রান্ত করতে পিছু হটতে হটতে মস্কোর কাছে চলে এসেছিল। হিটলার ভেবেছিলেন এই যুদ্ধে জয় তার নিশ্চিন্ত। নেতাজী বার বার হিটলারকে এবং তৎকালিন জার্মান কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দিয়েছিলেন রাশিয়া আক্রমণ না করতে। যদি নেতাজীর কথা হিটলার শুনতেন তাহলে ইতিহাস আজ অন্য রকমভাবে লেখা হত। নেতাজীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্ব রাজনীতির নানা কৌশল ছিল নখদপর্ণে। তিনি তাই জার্মানী থেকে চলে আসেন হিটলারের পতন অনিবার্য জেনে, এখানেই দিব্যপুরুষ এবং লৌহপুরুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমর নায়কদের মধ্যে ছিল রাজাগুণের প্রাবল্য। যা তাদের ধ্বংসলীলায় তাণ্ডবে মেতে উঠতে বিন্দু মাত্র হৃদকম্প হয়নি। নেতাজী ছিলেন বর্তমানকালের অর্জুন। তার মধ্যে ছিল সত্ত্ব এবং রজোগুণের সমন্বয়, পৃথিবীর ইতিহাস দেখা গেছে সত্বগুণি বিবর্জিত মানুষ আদিকাল থেকে শুধুমাত্র রজোগুণের তীব্র প্রাবল্যে ইতিহাসের তথাকথিত নায়কেরা নিষ্ঠুর হত্যালীলা সংঘটিত করতে কোন চক্ষুলজ্জার ধার ধারতেন না। দুর্যোধন, কর্ণ, রাবণ এরা ছিলেন বিপুল শক্তিসম্পন্ন রজোগুণের আধার, কিন্তু এদের মধ্যে ছিল না কোন ছিটফোঁটা সত্ত্বগুণের নির্মল সুবাস, যা মানুষকে সাহায্য করে সত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

শুধুমাত্র রজোগুণকে আশ্রয় করে জীবনপথে চলতে কি পরিণতি হয় তা অনুপমভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রখ্যাত লেখক এবং শিক্ষাবিদ ডাঃ রমাপ্রসাদ ব্যানার্জী তাঁর সদ্য প্রকাশিত। "Gita for Work and Life." -এ । তিনি লিখছেন, " While cultivating

the energy, strengh and power towards life dynamic, the Rajat guha person may be come a problem for the work. An example of a Raja guha person is there in the Mahabharat. Duryadhana personality exemplified rajah guna: he was powerful and enegetic, capable of ta.....

সর্বকালে সর্বযুগেই দুর্যোধনের এই পৃথিবীর মাটিতে তাদের দর্পিত পদধ্বনিতে কম্পিত করেছে। এরা সবাই ডাঃ ব্যানার্জী বর্ণিত দুর্যোধন এবং কর্ণের মানসজাত বংশধর যাদের মধ্যে প্রবল রজোগুণ ভালো ছিল না। সত্ত্বগুণের বিন্দুমাত্র ছিটেফোঁটা, একমাত্র ব্যতিক্রম সুভাষচন্দ্র। তিনি ছিলেন সত্ত্বও রজোগুণের অপূর্ব সমন্বয়ে এক হৃদয় পরিপূর্ণ মহানায়ক। হৃদয় না দিলে হৃদয় পাওয়া যায় না। ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না। জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। নেতাজী তাঁর হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা এবং জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশমাতৃকার চরণে, তাই সেদিন ইতিহাসের মহেন্দ্রক্ষণে রক্তস্নাত দক্ষিণপর্ব এশিয়ার ভয়ংকর রণাঙ্গণে প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁদের জীবনদেবতাকে নিঃদ্বির্ধায় সমর্পণ করেছিলেন ধন, জন এবং জীবনের প্রতিটি রক্ত বিন্দু।

মানুষ যখন পরমের দর্শন পায় তখন তাঁর জীবনের সমস্ত ভোগ্যবস্তুর আকর্ষণ তুচ্ছবোধ হয়। সম্পদ, দেহসম প্রাণপ্রিয় প্রিয়জন তাঁর কাছে মূল্যহীন অসাড়ে পরিণত হয়। প্রলয়ংকারী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিষীকাময় কালরাত্রিতে মৃত্যু, যন্ত্রণা এবং ক্ষুধার মধ্যে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ এবং ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেডের অসীম সাহসী আত্মত্যাগী নারী এবং পুরুষেরা নেতাজীর মধ্যে এক অলৌকিক দৈব পুরুষের দর্শন পেয়ে জীবনধারণ তাঁদের কাছে সার্থক হয়েছিল। মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁদের ছিল না কোন অভিযোগ ছিল না কোন পিছুটান, ছিল না কোন স্বার্থের সংঘাত, কেন না তাঁরা যে দর্শন পেয়েছেন পরমপুরুষ নেতাজীর। শাহ নওয়াজ খান তাঁর পুস্তকে আজাদী সৈনিকের যে অচিন্তনীয় এবং অভূতপূর্ব কাহিনীর বর্ণনা করেছেন তা পাঠ করলে এইসব অমর দেশপ্রেমিক সৈনিকের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথানত হয়ে যায়।

খাদ্য নেই, ঔষুধ নেই যুদ্ধের রসদ ফুরিয়ে অকাল বর্ষণে তখনও এই বীর সৈনিকেরও সংকল্পে অটুট। তাঁদের মনোবলে একটুও চিড় ধরেনি। কঠিন লড়াই করে চরম সাফল্যের কাছে আবহাওয়ার ভয়ংকর প্রতিকূলতার জন্য যখন তাদের পশ্চাদসরণ করতে হয়তা ছিল ইতিহাসের চরম দুর্ভাগ্যের ঘটনা। তখনকার কথা উল্লেখ করে শাহনাওয়াজ খান লিখছেন, " এইরূপ অনাহারে ভীষণ বর্ষার মধ্যে হাঁটু সমান কাদা ভেঙ্গে মারাত্মক মালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশা এবং বিষধর পোকা ভরা নিবিড় অরণ্যপথে আমাদের সৈন্যদের পশ্চাদসরণ করতে হয়।

এই সময় আমাদের সকাল প্রকার বিধিব্যবস্থাও বিনিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারদের ঔষুধ ছিল না যে চিকিৎসা করবেন, তাছাড়া তাঁরা নিজেরাও ম্যালেরিয়া ও আমাশয় ভুগছিলন, আশেপাশের জঙ্গলে বড় বড় সব মাছি ভন ভন করত মৃত মানুষের মৃতদেহের উপর দিবারাত্র বসে। এছাড়া আরও কতরকম বিভৎস দৃশ্য যে দেখা যেত তা বর্ণনা করা যায় না যে একবার এই দৃশ্য দেখেছে জীবনে সে কখনও ভুলতে পারবে না।

পশ্চাদসরণের পথে একবার আমি দেখি একধারে এক যুদ্ধে আহত সৈনিক পড়ে রয়েছে। কয়েকমাইল হেঁটে যাবার সে ার চলতে পারছে না। পথের ধারে পড়ে থেকে মৃত্যু এসে কখন তার সকল জ্বালার অবসান করে দেয় তারই আকাঙ্ক্ষা সে করবে, ক্ষতস্থানে তার পোকা কিলবিল করছে—মৃত্যুর আর বড় বেশী দেরি নেই। আমি তাঁর কাছে গেলে সে চোখ মেলে আমার দিকে তাকালে, সে একবার উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু উঠবার তার শক্তি ছিল না। সুতরাং সে আমাকে তাঁর পাশে বসতে ঈঙ্গিত করলো, এমনি করে আমায় বসিয়ে সে বললে, সে আমার কাছে কয়েকটি কথা বলতে চায় যা তার হয়ে আমাকে নেতাজীর কাছে বলতে হবে। কথাগুলি বলবার সময় তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল, সে বললে—"সাহেব আপনি তো ফিরে যাচ্ছেন— নেতাজীর সাথে আপনার দেখা হবে, কিন্তু আমার সাথে তাঁর দেখা হবে না। তাঁকে জয়হিন্দ জানিয়ে বলবেন—তাঁর কাছে আমি যে অঙ্গীকার করেছিলাম সে অঙ্গীকার আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, কি করে আমার মৃত্যু হল সে কথা আপনি তাঁকে খুলে বলবেন। আমার জীবন্ত অবস্থাতেই পোকা কেমন কুরে কুরে খেয়েছে সে কথা বলবেন, আর এ কথাও তাকে বলবেন—এই নিদারুণ যন্ত্রণার

মাঝেও এক দিব্য আনন্দ ও অপূর্ব শান্তি পাচ্ছি আমি মনে। কারণ প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে— আমি আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিচ্ছি।" এটা শুধু এ কথা নয়— প্রতিদিন এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটত। সৈন্যরা এতখানি মনের বল যে কি করে পেল ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়— মুহূর্ত সৈন্যরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নেতাজী এবং তাঁর কাছে তারা অঙ্গীকার করেছে তার কথা ভুলতে পারেনি।" ঐ পৃ. ১২৮-১২৯

সমস্ত গায়ে পোকা কিলবিল করছে, অসহ্য যন্ত্রণা, মুখে একটু জল দেবার কেউ নেই মৃত্যু এসে যে কোন সময় জীবনদীপ নিভিয়ে দেবে, ভাবলে আশ্চর্য লাগে এই সৈনিক মৃত্যু সন্নিকটে এবং প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেও বলছেন যে তিনি এক অপূর্ব শান্তি এবং দিব্য আনন্দ অনুভব করছেন। কেননা তিনি তাঁর ইষ্টদেবতা নেতাজীক সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন,

শাওনাওয়াজ খান আরও লিখেছেন, " আমি বহুবার দেখেছি আমাশয় আর বেরিবেরিতে ভুগে সৈন্যদের মুখ এবং পা ভীষণভাবে ফুলে গিয়েছে—এত দুর্বল যে এক পা আর তাদের চলবার শক্তি নেই। এই অবস্থায় তাঁদের অফিসার ক্রমে এর মধ্যেই ভুলে গেলে? বীরের মত তোমরা সকল দুঃখফল অকাতরে সহ্য করবে—এই তোমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল না? এখান থেকে ৫০ মাইল দূরে কালওয়াতে আমাদের নেতাজী আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন, সেখানে নিয়ে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করে না তোমাদের"? এই সব বলে অফিসার যেই তাদের উঠে চলতে হুকুম দিতেন—অমনি যেন কোন্ যাদুমন্ত্রের শক্তিতে তাদের নির্জীব দেহে কত বল ফিরে আসত। আমি এখনও দেখেছি তাকে রুগ্ন সৈনিক নেতাজীকে একবার দেখবার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে এই ৫০ মাইল পথ গেছে এবং গিয়ে নেতাজীকে দেখামাত্র তাদের অনেকে হাসিমুখে মারা গেছে। তাদের মনে এই শান্তি যে তাদের পরম প্রিয় নেতাজীর দেখা তারা পেয়েছে।" ঐ—১২৯

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছেন ঈশ্বরের দর্শন হলে সমস্ত বস্তুই হয়ে যায় অবস্তু। পরমের দর্শন হলে এই জগতের মূল্যবান ভোগ্য সামগ্রী তখন আলুনি মনে হয়। দিব্যানন্দে তখন সে তখন এই মর্ত্যভূমি ছেড়ে চলে যায়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী এবং পুরুষের কাছে নেতাজী ছিলেন ঈশ্বরের সাদৃশ্য। তাই আঘাতে আঘাতে জর্জরীত নিদারুণ মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে ঘাসের রুটি খেয়ে তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাদের ছিল না মর্তলোকের কোন কামনা বাসনা। তাদের একটাই বাসনা ছিল দৈবপুরুষ নেতাজীর আদেশ পালন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে একবার দর্শন, স্বয়ং ভগবান তাদের কাছে মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই গভীর বিশ্বাস তাদের মৃত্যুঞ্জয় করে তুলছিল।

নেতাজীর প্রেরণায় আজাদী সৈনিকেরা মানসিক স্তরের যে বিরাট উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন তা বহু বৎসর কঠোর সাধনার দ্বারা যোগীরা লাভ করে থাকেন, অনাহার এবং মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও শত্রুপক্ষের প্রবল প্রলভন তাঁদের দেশপ্রেমের মানসিক বিচ্যুতি ঘটাতে পারেনি। নেতাজীর কাছে তাঁরা যে অঙ্গীকার করেছিলেন অনাহারে মৃত্যুর সামনেও তারা সে শপথের মর্যাদাকে পবিত্রতার সাথে রক্ষা করেছেন।

ঘাসের রুটি এবং মৃত ঘোড়ার পচা মাংস খেয়ে তারা অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণ করেছেন। চারদিকে শত শত মৃত সৈনিক, ম্যালেরিয়া আমাশয়, মৃতদেহের অসহ্য দুর্গন্ধ, শকুন, চিল এবং যা নারকীয় উপদ্রপের মধ্যে তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও শত্রুপক্ষের লোভনীয় প্রলভনের মধ্যেও তাঁরা মাতৃভূমি এবং নেতাজীর প্রতি ছিল আনুগত্যে অটল, চরমতম দুঃখ এবং মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁরা নেতাজী এবং মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে আত্মত্যাগের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শত্রুপক্ষকে মুখের মত বার দিয়ে মহান হয়ে থাকবেন চিরদিন।

দীর্ঘদিনের অনাহার, মারাত্মক অসুস্থতা, ক্ষত-বিক্ষত ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মৃত্যুর হাতছানির মধ্যে মানুষ খড়কুটো ধরে বাচবার চেষ্টা করে। ব্রিটিশেরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এই সম্বন্ধে শাহনাওয়াজ লিখেছেন, " নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের মনের বল নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে ব্রিটিশেরা এই সময় তাদের প্রলুব্ধ করে দলে টানতে চেষ্টা করত। ব্রিটিশ কম্যান্ডারের নামে সই করা রাশি রাশি ছাপা কাগজ তারা এরোপ্লেন থেকে এদের মাঝে ছড়াত। তাতে যা লেখা থাকত তার যথার্থ এই রূপ—"আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ তোমাদের গুলি বারুদ নেই। ঔষুধপত্র নেই, খাবার নেই—জঙ্গলের

ঘাস খেয়ে বন্যজন্তুর জীবন তোমরা যাপন করছ। আমাদের দলে এস, ভাল খেতে পাবে, ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা পাবে, তাছাড়া ভাল বেতন পাবে। সবার শেষে পাবে-পুরস্কার, তোমরা এত পাষণ হয়েছে কেন? তোমাদের ছেলেমেয়ে তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছে, আমাদের কাছে এস, আমরা তোমাদের তিনমাসের ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠাবে, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—সত্যি তোমরা এসব পাবে, ভয় পেও না, এই আমরা তোমাদের সাদর সম্বর্ধনা করে গ্রহণ করব।" আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা তখন দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হয়েছিল—সুতরাং এই প্রলোভন জয় করা তাদের পক্ষে কতই না কঠিন, তবু একবাক্যে তারা সবাই এর উত্তরে বলেছিল—"আমরা বরং পশুর মত বনের ঘাস খেয়ে স্বাধীনজীবন যাপন করব, তবুও সুখাদ্য খাবার বা নিজেদের সন্তান-সন্ততির কাছে খাবার লোভে ব্রিটিশের ক্রীতদাস হয়ে মান খোয়াব না।" সত্যি তারা মান খোয়ানোর চেয়ে মৃত্যুকে অধিকতর কাম্য বলে মনে করেছিল।" ঐ-পৃঃ ১২৫-১২৬

কি অকল্পনীয় মানসিক শক্তি। দেশের প্রতি, নেতাজীর প্রতি কি অসাধারণ জয় প্রশ্নতীত হৃদয়-জুড়ানো আনুগত্য-ভালবাসা যা ইতিহাসে বিরল, সহস্র দীপ্ত আভা নিয়ে নিয়ে নেতাজী সৈন্যদের হৃদয়দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অনির্বাণ দীপশিখা তাদের হৃদয় মন্দিরে আমৃত্য প্রজ্বলিত ছিল অপরিসীম শারীরীক কষ্টের মধ্যেও, মাথা উঁচু করে সানন্দে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্য তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন। কে আগে যুদ্ধে যাবে, কে আগে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের জন্য প্রাণ বিসর্জন করবে এ নিয়ে অনেক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল যা আজকের এই ঘনায়মান অন্ধকার যুগে কল্পনাও করা যায় না। রুগ্ন এবং জখম সৈন্যদের সমস্ত শারীরিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শাহনাওয়াজ খান তাঁর পুস্তকে এমনি একটি হৃদয়স্পর্শ চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, "সামরিক শিক্ষা শেষ করে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও রণসজ্জায় ঘাঁটতি কিছুটা পুষিয়ে নিয়ে ১ নং (সুভাষ ব্রিগেড) রিজিমেন্ট ১৯৪৩ সালের ৯ই নভেম্বর তাইপিং থেকে ট্রেনযোগে রেঙ্গুন যাত্রা করে। যাত্রার দিন তাইপিং রেলওয়ে স্টেশনে যে দৃশ্য দেখেছি সে দৃশ্য জীবনে ভুলবার নয়। যে সব রুগ্ন অশক্ত ডাক্তার তাইপিং ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন, তারা স্টেশনে এসে গাড়ী ছাড়তে দেবে না। তারা বলতে লাগলেন—" আমরা নেতাজীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে দেশের কাজে আমরা জীবন দেবো, আমাদের এখানে ফেলে রেখে সে সুযোগ বঞ্চিত করতে আমরা দেবো না।" তাদের অনেকবার বুঝিয়ে বলা হল— আশ্বাস দেওয়া হল যে তারা সুস্থ হয়ে উঠলেই তাদের আবার রেজিমেন্টে যোগদান করবার সুযোগ দেওয়া হবে। তখন তারা ইঞ্জিনের সামনে থেকে উঠলো।" ঐ- পৃঃ ৯৯

মানুষ যখন পরমের সন্ধান পায় তখন তার কাছে পার্থিব জীবনের সুখ তৃণসম বোধ হয়, শত দুঃখ কষ্ট তখন তাকে তার আদর্শ থেকে সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। দীর্ঘদিন অনাহারে অর্ধাহারে কাটিয়েও তাদের মনোবল বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। বনে-জঙ্গলে ঘাসখেয়ে তারা জীবনরক্ষা করেছে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য। কি অসাধারণ আত্মত্যাগ। খাদ্যের অভাবে "লিঙ্গরা" নামে পাহাড়ের ঘাস খেয়ে তারা কাটিয়েছে। শ্রদ্ধায় মাথানত হয়ে আসে। যে নাগা ভাইরা কিছুদিন আগে স্বাধীনভারতে বিচ্ছিন্নতাবাধে আক্রান্ত হয়েছিলেন তারাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নিজেদের "রাজা" মনে করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আজাদ-হিন্দ বাহিনীকে দু-হাত উজাড় করে সাহায্য করেছিলেন। নেতাজীর দেবপ্রতিম চরিত্র, দেশমাতৃকার জন্য বিস্ময়কর আত্মত্যাগ এবং বীরত্বে নানালাভ বাসীরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে শাহনাওয়াজ খান লিখছেন, " ১৯৪৪ সালের জুন মাস প্রায় শেষ হতে চলল। ভীষণ বর্ষণ শুরু হয়ে গেল—সরবারহের একমাত্র পথ তামু-পালেন সড়কের উপর দিয়ে এ প্রবল বন্যার স্রোত বইছে। আমাদের সৈন্যদের বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া, সরবরাহের রাস্তা নষ্ট হওয়ার রসদও যুদ্ধ সরঞ্জাম পাওয়াও বন্ধ। বড়ই ভাবনার কথা হয়ে উঠল। নতুন সরবরাহ না পেয়ে আমাদের সৈন্যদের হয় এখান থেকে পশ্চাদসরণ করতে হবে। কর্ণেল ইনায়ড কিয়ানির কিন্তু এ যুদ্ধ একবারে পছন্দ হোল না— তিনি বললেন " তামু থেকে যদি রসদ না আসে, তবে আমাদের নিজেদের এলাকা থেকেই আমরা রসদ সংগ্রহ করে নেব।" যে সময়ের কথা বলছি— তখন ২০০ বর্গমাইল বিস্তৃত ভারতভূমি তাঁর (কর্ণেল কিয়ানির) অধিকার ছিল। নেতাজী প্রেরিত আজাদ হিন্দ দল ইউনিটের সাহায্যে তিনি এই অঞ্চল শাসক করছিলেন। এই ইউনিটকে স্বাধীনকৃত অঞ্চল কি করে শাসন করতে হয় তা বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

কর্ণেল কিয়ানি এখানকার নামকরা নানা সর্দারদের ডেকে এক সভা করে রসদের অভাবে সৈন্যদের কি দশা হয়েছে ভাল করে

বুঝিয়ে তাদের বললেন— ওখান থেকে যদি রসদের ব্যবস্থা না হয়, তা হলে তাঁর সৈন্যদলকে তামুতে ফিরে যেতে হবে। নানা সর্দস্যরা কিয়ানির পশ্চাদসরণ করতে নিষেধ করে বললে, " আপনাদের ফৌজ ভারতের মুক্তি ফৌজ— আমাদের মিনতি আপনারা ফিরে যাবেন না। খাদ্যদ্রব্যের আমাদের গুরুত্ব অভাব, তবুও যতটা পারি আমরা আপনাদের খাদ্যসংগ্রহ করবে। যদি না খেয়ে মরতে হয় তো এক সঙ্গেই মরব, বাঁচি তো এক সঙ্গেই বাঁচি এক সঙ্গেই বাঁচব। তারপর তারা নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সাধ্যমত আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য রসদ সংগ্রহ করে আনি। কিন্তু সে আর কতটুকু! পাহাড়ে জায়গা থেকে ২০০০ সৈন্যের দীর্ঘকালের রসদ সংগ্রহ করা বড় সহজ কথা নয়। তাদের আনা রসদ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল— আবার শুরু হল সেই রসদের জন্য দুর্ভাবনা।

নাগাদের একটুখানি পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন। এরা পার্বত্য জাতি—ইম্ফলের চারিধারের পাহাড়ে এদের বাস, সব চেয়ে বড় কথা-এরা সাহসী ও দেশভক্ত। আমাদের নানাভাবে এরা সাহায্য করেছে, আমাদের টহলদার সৈন্যদের এরা পথ দেখিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে—শত্রুর গতিবিধি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় খবর এনে দিয়েছে, সবার উপর এরা রসদ দিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। এদের কেউ কেউ ব্রিটিশদের একবারে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। তারা বলে— তাদের রাণীকে নাকি ব্রিটিশেরা বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে। নাগাদের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে—তারা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে একেবারেই রাজী নয়—এই জন্য জাপানী অধিকৃত অঞ্চলে আমরা ব্রিটিশদের চাই না— জাপানীদের চাই না। এ অঞ্চলে আমরা আমাদের রাজারূপে চাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসকে।

শাহনাওয়াজ খান লিখেছেন নাগারা সাহসী এবং দেশভক্ত, এরা আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের খুব সীমিত সাধ্যের মধ্যে চরম বিপদের দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এবং নেতাজীকে পরম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন নিজেদের রাজারূপে।

স্বাধীন ভারতে এই নগাদের সাথেই কংগ্রেস সরকার চরম দুর্ব্যবহার করে তাদের বিচ্ছিন্নভাব পথে ঠেলে দিয়েছিল। নেতাজী থাকলে তারা ভারতের বন্ধুরূপ আনন্দের সাথে ভারতের মূল সমাজের সাথে কাধে হাত রেখে ভারতের উন্নতির জন্য কাজ করতেন।

নেতাজীর আকাশচুম্বী আত্মবিশ্বাস এসেছিল কঠোর সাধনার মাধ্যমে যা তাঁকে ঈশ্বরময় করে তুলেছিল। তাই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয় জনগণ এবং আজাদী সৈন্যরা নেতাজীকে একজন দৈবপুরুষ হিসাবেই পরমশ্রদ্ধার আসনে অভিষিক্ত করেছিলেন ভয়ংকর যুদ্ধ তিনি সামনে থেকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, মাথার উপরে মেসিনগানের গুলি কান ঘেষে চলে যাবে। নেতাজী ছিলেন ভয়হীন, নির্ভীক উদাসীন। তিনি জানতেন দৈবশক্তি তাঁকে এতদিন ভয়ংকর পথ পরিক্রমায় রক্ষা করেছিল এবং এই ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যেও তিনি রক্ষা করবেন, তাই নিশ্চিন্ত মৃত্যুমুখে তাঁর অবিশ্বাসভাবে বার বার রক্ষা পাওয়া তাঁর সহকর্মীদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে স্বয়ং ঈশ্বর নেতাজীর উপর ভর করে তাকে প্রতিনিয়তই অবধারিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করছেন, রণক্ষেত্রে শত্রুরা যখন বিপুল সৈন্যদল এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেতাজীকে প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছে এবং মৃত্যু প্রায় নিশ্চিন্ত তখন তার সেনাপতিরা কাতরভাবে বারে বারে অনুরোধ করেছিল এই স্থান ত্যাগ করে যেন নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য তখন নেতাজী সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করে বলেছিল ইংরেজ এখনও এমন কোন অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি যা দিয়ে তাঁকে মারতে পারে। কে এমন কথা বলতে পারেন? যিনি জানেন যে দৈবশক্তি দ্বারা তিনি সুরক্ষিত। যতদিন তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ না করছে ততদিন ইংরেজ কেন বিশ্বের কোন শক্তির ক্ষমতা নেই তাঁকে (নেতাজীকে) হত্যা করে। বর্মার রণাঙ্গনে মিকটিলা নামে জায়গায় যখন প্রায় অরক্ষিত নেতাজী আকাশে শত্রুবিমান এবং মাটিতে ইংরেজ সৈন্যদের প্রায় নাগালের মধ্যে তখন শাহনাওয়াজ খান প্রমুখ সেনাপতিরা নেতাজীকে সুরক্ষিত জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন তখন নেতাজী প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে কি উত্তর দিয়েছিলেন তা শাহনাওয়াজ খান লেখনীতে জানা যাক, শাহনাওয়াজ খান লিখেছেন, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী মহবুব আহম্মদ এবং আমি মিকটিলায় ফিরে এসে পোপা রণাঙ্গনের সমস্ত অবস্থা নেতাজীকে জানালাম। আমি তাঁকে বললাম—যুদ্ধের অবস্থা নেতাজীকে জানালাম। আমি তাঁকে বললাম— যুদ্ধের অবস্থা সেখানে বড় গোলমালে। এরূপ অবস্থায় তার আর অগ্রসর হওয়ার

খুবই বিপজ্জনক, সুতরাং তা করার উচিত হবে না, খোলামাঠে রাত্রি দ্বিপ্রহরের অনেক পরে সেনালোক আমাদের এই সব আলোচনা, দূর থেকে কামানও মেসিনগানের ছোড়া আগুন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। অবস্থা অতি সঙ্কটময়। যে কোন সময় মুহূর্তে ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক এসে নেতাজী সমেত মিকটিলা অধিকার করে বসতে পারে, মেজর রওমাত (Rawat) কর্ণেল মহবুব ও আমি নেতাজীকে বার বার আনুরোধ করতে লাগলাম—পোপায় যাবার সঙ্কল্প তিনি যেন পরিত্যাগ করেন।

ঠিক সেই সময় এক জাপানী এসে বললেন—শক্তিশালী ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া বাহিনী আমাদের ব্যূহ ভেদ করে পাইনবিন (Pyinbin) অধিকার করেছে এবং মিকটিলার ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিম অবস্থিত তাউঙতা (Taungota) আক্রমণ করবার উদ্যোগ করেছে। তিনি সেই রাত্রেই নেতাজীকে মিকটিলা ত্যাগ করে পাইনথালার দিকে সরে যেতে বললেন। ওখানে ১ নং ডিভিসনের সৈন্যদল আছে— শত্রু এদিকে এগিয়ে এলে দরকার হলে তারা তাদের সঙ্গে লড়তে পারবে। তিনি নেতাজীকে আরও জানালেন যে, তাউঙমা ও মিকটিলার মধ্যে শত্রুকে বাধা দেবার সৈন্যদলও এখনও আমাদের হাতে নেই। নেতাজীর দেহরক্ষার জন্য যে কুড়িজন সশস্ত্র প্রহরী আছে, তাদের কাছেও রাইফেল ছাড়া অন্য অস্ত্র নেই—মাত্র এই তোড়জোড় নিয়ে সাঁজোয়া বাহিনীকে বাধা দেওয়া যায় না। মিকটিলা ছেড়ে যাবার জন্য আমি বার বার নেতাজীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে লাগলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না, অবশেষে সকল ধৈর্য্য হারিয়ে তাঁকে বললাম—"নেতাজী আপনি চড় স্বার্থপরের মত কাজ করছেন— শুধু বীরত্ব দেখানোর জন্য আপনি নিজের জীবন বিপন্ন করছেন কিন্তু এমনি করে নিজের জীবন বিপন্ন করবার অধিকার আপনার নেই। আপনার জীবন ভারতবর্ষের একটি অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ আমাদের কাছে গচ্ছিত আছে। এ আমি এমনি করে বিপন্ন হতে দিচ্ছি না।" আমি আবার তাকে মিনতি করে বললাম—"নেতাজী একবার ভেবে দেখুন যদি কোন রকমে আপনার কিছু ঘটে—আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কি হবে?

তিনি ধীর চিত্তে আমার সব কথা শুনলেন— কারণ তিনি জানতেন আমি যা বলছি তা প্রাণ থেকেই বলছি এবং তারই নিরাপত্তার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েই বলছি। আমার বলা শেষ হলে তিনি মৃদু হেসে বললেন—"শাহনাওয়াজ আমাকে এরূপ অনুরোধ করা বৃথা। পোপায় যাওয়া আমি যখন সাব্যস্ত করেছি, তখন সেখানে আমি যাবই। আমার জন্য তুমি ভেবো না, সুভাষচন্দ্র বোসকে মারতে পারে এমন বোমা ইংল্যান্ডে এখনও তৈরী করতে পারেনি।" নেতাজী যা বলেছিলেন তা সত্যিই বস্তুত তাঁর জীবন যেন দৈবশক্তির এক রক্ষা কবচে ঘেরা থাকত। সেই দিনই বিকালে তিনি যেখানে ছিলেন সেই স্থানটির উপর শত্রুরা ষাটখানা B-255 বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে—ফলে চারদিকে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আশ্চর্য—নেতাজী কি করে অব্যাহতি পেয়েছিল, তাঁর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।"

ঐ — ১৬১-১৬২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম পর্যায় মিত্র বাহিনী জয় এবং হিটলার, মুসোলীনি এবং জাপানের পরাজয় হলেও ইতিহাসের এই ঘনতমসার দিনে নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ মিত্র শক্তি এবং ইংরেজ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। সাময়িক বিপর্যয়ে নেতাজীকে কৌশলগত কারণে যুদ্ধনীতির অনেক পরিবর্তন করতে হয়েছিল মিত্রশক্তির বিধ্বংসী মানবতা বিরোধী রণনীতির বিরুদ্ধে। জাপান তখন আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত। নেতাজী যখন খবর পেলেন জাপান আত্মসমর্পণ করেছেন তখন তাঁর সেনানায়ক এবং পরামর্শ দাতাদের সাথে বৈঠক করে ঠিক করলেন তিনি মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না এবং নতুন রণনীতি ঠিক করে দিল্লীর পথে অগ্রসর হবেন, কেন না দিল্লীতে পৌঁছবার অনেক পথ খোলা আছে। প্রবল আত্মবিশ্বাসী নেতাজী জানতেন ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন। তিনি ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ সালে এক বিশিষ্ট বিশেষ ঘোষণায় বললেন, " The roads to Delhi are many and Delhi still remains our good."

এই অপরাজেয় বিপ্লবী যোগী যে সংকল্প নিয়ে তাঁর শৃঙ্খলিত চিন্ময়ী মাতৃভূমির (Divine Motherland) মুক্তির সন্ধানে ঘর ছেড়েছিলেন তিনি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ভারত মাতার মুক্তি সূর্যের তিনিই একমাত্র নিঃশঙ্ক এবং নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল পবিত্রতম ব্যক্তিত্ব। যিনি যুগে যুগে মানুষকে প্রেরণা দিবেন মহান কর্মে জীবন উৎসর্গ করতে।

—ঃঃ—

The Truth

Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee

'Satyam eva Jayatae' Truth alone wins (-in the ultimate turn). However, the identification of truth takes place based on the power and quality of identifying the same.Usual understanding of truth is that which is evidential in nature. Visible, audible, touchable, tangible, having any element that is traceable something contributes to the concept of truth. Any idea of truth, according to modern scientific perception of the same, has the basis of either material understanding or material basis. The basis of material understanding is thus that of something that can be proved on rational parameter as it does things that rests on the solid understanding of the material content of the element. The organs of senses determine the basic truth with all its variants and appendages. This is the way and process to have an approach to the truth of the world. This is known as the empirical truth. Empirical truth as such can be defined approximately as something which is measurable, countable, having some identity that can be traced by using the organs of senses and their supports. The material content of any living or the non-living organisms prove the identity of the element as a matter of facts. However, this as a fact as measured, counted, felt, seen, heard of, tasted or perceived, may not reveal the intrinsic reality. It will reveal the factors that are extrinsic fully and some fragment of the intrinsics. The intrinsics in this series is actually that blended with the psychological perspectives. This as such would be pushed to the horizons of the world. The horizons of the world as determined by the psychological premise of the understanding. It is as such the way of such understanding in such a way that reminds of the surficial understanding of any material understanding. This material understanding is just a part of the complete truth in the existence. The existential understanding as such elements or incidents push the human understanding to a different level in the short term and creative in the long term. As such the factors of the creative dimensions focus on the aspects that are only experiential in nature. Experiential because this truth can be truly realized in the true sense of the term.

Truth, therefore, gets revealed in the empirical sense. As we see the sky, water, the land, forest, structures of various kinds, lives that are visible and those which are as such not visible. This is the way to judge and determine things acceptable from the empirical sense and as such things that are available from a different sense of the term. Factors which make it happen in the process of recognition as truth are either biological or extensions of the biological faculties and its extended factors. Beyond this kind of scientific understanding any finding or understanding focus and understanding of the human society. This gives the idea of a different level and variety of truth. Truth needs realization and experiencing to understanding the facts of life.

Many forms or the formsless, the Supreme at times makes his appearance in the historical continual in formless approach. He is the realized spirit through the pathways of incarnation. This form of incarnate of god reveals the divine attributes and establishes truth on earth.

Ekam Sat Viprah bahudha vadanti.
Agnim yamam Matarishvam aahum. (Rig Veda 1-164-46)

The ultimate truth is that of one unified oneness of the wholesome. (He is called by 'Paramatmana' the Supreme Soul, by 'Purusha' the cosmic being in his own manifestation in infinitely varied forms, as also, he is known as 'Sat' the total truth. That is why the Vedic sages had received the realization through their meditation or other spiritual process have realized the same cosmic truth of God but revealed through many different processes. Some have identified the Supreme through many different processes. Some have identified the Supreme through the fire as flamed in the sacrificial fire 'Yajnagni'. Some of other realized sages have known him as the lord Yama or the motherly forms, as the 'Matarishva' the revealed truth in the form of holy mother. As such the varied ways of realization have made his revelations in varied and other ways suited to the forms and approaches of the sages having realized the same. Though visualized in different ways, the sages have identified the essence as such that it fits in the understanding of humans of infinitely different categories. The Supreme is thus revealed in the creation allowing his realizations in many ways.

Ekah vayuh yatha bhubanam prabishtoh
Rupam rupam pratirupah babhuban.
Ekah tat ha sarbabhutah antahaatmah
Rupam rupam pratirupah bahih cha. *(Kathoupanishad 2-2-10)*

The empirical understanding of the world happens through the biological means or any kind of extension or multiplier of it. The Supreme is unified and one and his presence is understood in fragments of time, space, perceptions and other. The human self thus gets realization of the Supreme through the fragments that are scattered across with or without the understanding of other aspects of revelation of God. He is present everywhere as formless, colourless, non entity but infusing all energy, strength, power of consciousness to make the entire creation move and run on the pathways of the worlds moving forward and across. The example of air is given. Air is present in every life, form and existence. Air does not have any form of its own as that does not get contained in any of the forms. The Supreme is invisible but brings in all the vital energy and force based on that. The presence of divine in a form makes the form attain the strength through the cirvtion coming within. The vital energy makes life going. Then with the presence of providence the air inside acts as the provider and stimulating agent for the cells within the existence. Thus it suggests the functioning of organs in a given conditions of the nature, the boundary condition of the living in the ways and opportunities created. Human, sub-human creation and the power of the fragments, Supreme is immanent, he is formless- yet resides in all forms. Its presence only makes the life going. Lord himself at time, the same is immanent and transcendental.

God reveals humself to those who aspires in real terms of those who aspires to attain the true realization of God. True realization happens through meditation, devotion, love for God and aligning the functions of life in accordance. This in turn makes a person a devotee with deep faith. Faith in the intrinsic understanding is one that does not depend on anything that may stand in the way of getting in touch with the divine spirit. Divine spirit has the wholesome presence as to create rupture in the entire pattern. Divine is one and all inclusive. He is present in all living and non-living objects.

Kasmin nu BhagavahVijnatae
Sarvam idam vijnatam bhabati iti? (Mundak Up. 1.1.3)

When a person attains the wisdom of the divine knowledge of the world and that of the transcendental conditions get revealed to him or her. This was a relevant question by some people that any element of wisdom is available or not knowing which the knowledge of everything is made available to the person. Rishi understood the answer through the divine way: 'Brahmavidyam Sarvavidya Pratishtham' or the knowledge of Brahman stands fulfilling to the quest of knowledge for everything. He is immanent in all situations and contexts. Brahman is that magnificent spirit which is not only at the core of every element but also stands as fulfilling to all dimensions of life.

Tasmoisa hi ubachah - dvevidyae veditavyae
Iti ha smah yad Brahma vidyae vadanti parah cha Aparah cha. (Mundak Up. 1.1.4)
tasmaisahovāca .dvevidyeveditavyeiti ha sma. yadbrahmavidovadantiparācaivāparā ca

Broadly the wisdom of wholesome knowledge is classified into two types of knowledge one of this is the knowledge of material and empirical aspects of the world and the other one is the spiritual knowledge or divinely knowledge. The divinely knowledge leads to that of Brahman. The empirical material knowledge is that of the tangible-visible-measurable-countable dimension of the material world, however, the other one is that of the Supreme in the creation. As such the entire situation of the world can be classified into the empirical world and the other one is the material aspect of the world. These are known as 'Para Vidya' or divine wisdom and *'apara vidya'* or worldly knowledge.

Kaali Karali cha Manojaba cha
Sulohita yah cha Sudhumravarna.
Sphulingini visvasuchi cha devih
Lelayamana iti saptajihvah. (Mundak Up. 1.2.4)

The complete wisdom can be attained through spiritual ways. It is such a way that initiates the fixing of relations between two objects of the world. The functional reality of the world depends upon the factors of the world. These are the factors that make and attempt to create the finest objects and concepts of the human world. The spiritual understanding occurs through inward seeking. Int the journey towards inward world of an individual essential dimension happens to be the belief system of the person. Belief system grows through incremental assertion of faith within a personality. Gradually spiritual dimension spreads out in the entire elemental existence of the person. The spiritual aspects of realization gradually unfold. Sages got the realization of the cosmic motherhood. Gradual unfoldment of truth in the cosmic reality had revealed the forms and appearances of mother in the creation. *'Kaali', 'Karali', 'Manojaba', 'Sulohita', 'Sudhumravarna', 'Sphulingini', 'Visvasuchi', Devi Lelayamana* having revealed to take care of the spirit of God on earth. Seven different forms of mother. Each form of the mother has the mix of the power and strength of creation, maintenance and annihilation. The earth system acts as the creator-protector. Lives require the elements of sustainability. Providence and actions through initiatives of human being makes things happen in the world over times.

The entire creation needs nurturing, caring for the sustainability of the lives on earth. The forms of cosmic mother is to provide perspective to the creation on one hand and to allow the creation appropriate pathways towards the attainment of the cosmic flavour of truth in the particular manner as that of the requirement for ideal living..

Tat etat satyam
YathaSudiptat pabakat bisphulingah.
Sahasrasah prabhabantae svarupah.
Tatha aukshmaratbi bidhah soumya bhabah.
Prajayantae tatra cha aupibanti. (Mundak Up. 2.1.1)

That Supreme as identified in the process of realisation is the ultimate truth. That supreme reveals through the spiritual pathways of meditations, devotions and many other ways. The experimental understanding makes it clear about the relation between the human self and the Supreme existence. The transcendent self has been compared with a great fire of which a spark is considered to be the human life. The grace of god may make and establish the fact of fire has the power to burn. It carries the power to burn and create a fire or a flame of its kind. The comparison between the main fire and its spark reveals further the difference in the degrees of the quality and potent to burn. It has been said by the sages that the difference in the potent to burn does not create any discrimination in a sense. Rather this establishes the fact of potential oneness. Fire and its spark are one and the same in normative analysis. However in depth observation again reveals that the spirit of existence and growth makes fundamental position very clear. As the spark spent out period and thus reveal fire potential which exists in my oneness. The Vedic sages thus have established the connections. The Supreme has created this universe. This creation had the right in the way normative dimension. The principle fire, whenever that embodies in a person, it reveals divinity. Appropriation of such elements in the cosmic system needs focus of the divinely person. The creation thus maintains in the gamut of things, the support system for the growth and sustenance of such lives in the manner that it calls for. As such the divine intent to take care of everyone in the unique way begets that in the right manner. It is the basis of a new horizon for the best utility of the factors of the proper potentials to grow in every individual soul. The entire creation thus attempts to maintain the perspectives to allow all the potentials to get unleashed. In the eventuality the parameters and factors of growth in the persons may get partially blossomed and part of it getting spoiled in any way.

God's creation has three dominant core principles as can be observed from the traces of the attempts, maintenance of things and lives also for the growth of it. Human imaginations and aspirations at first need a shape or patterns for it to grow. However the core principles are maintained in a way that talks about the functional approach to attain somewhat height while achieveing the desired growth. In the process at times the individual life deviates from the core principles of the creation.

Core principles of Human Society: Three core principles as visualised by the sages of the Vedas are: *Equality - Fraternity - Liberty.*

God's creation has been designed as such that the entire human world has been gifted with the blessed position of making the world a place of real pleasant for every individualsequality demands a sense of commonality of factors, attributes, potentials, opportunities and recognitions. However

each one of these needs very special focus by the nations, regions of the world in their respective manner.

The basic problem occurs with individual human person. The contents of each person in terms of the power of mind and the level of consciousness make him or her different from the other. Individual differences create different clusters and combines in the human society. That's how the fragments have come up.

Indriebhyah para hi aurthah

Individual differences can be made to match with the contextual reality wherein the focus of one close parameter may harp on the other and as such with the kinds of mind that feel same approaches of similarities join hands to combine into a group or a cluster of many to focus on one aspect of the things of life and combine across that aspect. The sages during the Vedic period had observed as such the roles of elemental existence in life. From that perspective the thoughts and works of human has identified organs in human system as performers in their own ways. Organs perform the action may or may not be congruent to the objectives of life. The focus of such actions in life, usually, remains synchronized with some kind of thought or aspiration. The congruence can make things happen on the basis of quick thought or instant perceptions. The organs as such remain true to their respective rates and their effective utilization is seen and coordinated by the human mind. Sages have mentioned about the role of the individual biological organs. However mind focussed on the organs as such would make the human ability to perform superior to others. Mind attempts to form a series of activities that are ingrents to whatever a person does in his or her realm, a focus on the core principles would maintain the spirit during the function. This is as such the person makes breakthrough in the world in terms of self discovery through the thoughts and the coordination of mind guided by human intellect makes a better performance to happen with the support and guidance of the intellect which would follow the principles.

Mahatah param abyatam.

The organic senses of humans can catch a large part of the cosmic truth. Visible, tangible, measurable, quantifiable, aspects of the cosmic creations are actually understood through rational and logical ways, whereas the other dimensions of this being the invisible, intangible ones. The creation is explicit to an extent that is just a part of it, however, the larger part is not visible, quantifiable or tangible in nature. That is why the human reach of the rational minds in terms of having good knowledge is constrained by the biological limit of the person in the situations that would act as the forces of constrains and the limits imposed by the physical capacities. However the mental and psychological capacities can take the person's understanding to a horizon that it not only more penetrative but having the power of extending beyond the usual thought limits. It is as such a kind of dream world with the capacities of making dreams in the perspectives of the world of thoughts and actions.

In the conversation between Nachiketa, a young aspirant of the wisdom of God and that of Yama the lord of righteous principles, the later has elaborated in classified terms the knowledge of the lord, the Supreme. He says, the entire creation has the blessed presence of the Supreme lord within each in miniscule forms and thus the factors of existence as understood by the person in the usual way is a tiny fragment of the wholesome truth. That supreme is beyond all descriptions. He

is the superior-most, great and is fully revealed through his formless form of the cosmic self. Visualizing him requires the inner exploration of realization of that Supreme self within the cave of heart.

The cosmic self takes up human form, magnificent in spread such that his universality is revealed in all forms and elements in this world. It is such that any form of a person gets absorbed in the existential aspects of lives on earth.

Esha sarveshu bhuteshu gudah aatmana prakashayet.
Drishyatae tu augnaya buddhya sukshmaya sukshmabhih. (Kathopnishad 1-3-12)

The supreme soul is thus absorbed in the existential form of a person. This indicates the design of God's creation in such that the divine in the total form in its small elemental condition. But the presence of him is very specific answer to the question of life are answered properly in the sense that wisdom sets in as soon as the realization occurs in the person. The supreme 'purusa' exists into the inner domain of individuals in the cave of the heart as an infinitesimally small element. This refers to the care, concern and compassion, all of these divinely attributes are present in an autonomous presence within. It is as such that the autonomy way of functioning gets revealed through the autonomous process. Thus, the most important aspect of the divine being present and realized is that there happens transformation in the character of the person.

Uttishthitah Jagrah prapya baranah nibohatah.
Kashurasy hara nishita duratyaya
Durgam pathahtvam kaboyo badantih. (Kathopnishad 1-3-14)

Through the process of realization as it occurs the personal profile of the devotee. Transformation is essential for the spiritual journey. In the ordinary sense, individuals spend their time on the spectrum of mixed variety of attributes are prevalent where the usual human tendencies get into the factors of the human functions. As such, the personal character of the devotee matters a lot. It is a factor of human consciousness. The journey in life usually happens with the motto of attaining selfish gains throughout. In the act of the gains, the person would focus on the perspectives of material and non-material gains. This is a small constraint and a position limited to the conditions occurred through the boundaries of ego self of the individual. The human situation, as such, is that of a constraint and the liberty. The constraint is about the material and egoistic possessions. This is actually such a smallness and pettiness that pushes down to the small boundary across personal ego. This approach of making one small and smaller continues to make it happen in such a manner that makes it emerge as the next ways to ascend into the heights of achievement.

The sages of the Vedas thus gave calls to the young and youthful minds of the world and as such the conscious emergence as they have called him as the potential ones contributing to emergence of the individual functionaries and people of excellence. The potentials of individuals get flourished once the dormant potentials ripen. It is that functional possibility that would fit into the overall growth of the cosmic potent. If the person rises up to fulfill the realities that exist and the other dimensions which are not only realistic from rational point of view, but the dormant and invisible dimensions of life and the world remain unnotified from their focus. The sages gave call saying, Arise, awake and stop not until the goal is reached. Sages had identified the realization of God and attained the blessed lotus feet of the Lord of Lords, Lord Shiva.

Persons thus elaborate upon the requirements of the human world. As such, the formations of each of the soul are just the focus of the entire making of the new perspectives of the world. As such, the dynamics of the world as it so happens, beget the dynamics of the world.

Yat aushabdam aushparshan amaurupam
Aubyayam tatha auras am nityam augandhabat cha yat.
Aunadyam aunantam mahatah param dhrubam
Nichaya tam mrityum ukhat pramauchchyatae. (Kathopnishad 1-3-15)

The supreme is revealed through such an aspect of lives on the fulfillment of the requirements of the world of humans. **The formless form of the supreme thus occurs in such a way that the development of the aspects of the world.** As such dynamics in the world requires an inward journey that allows the fulfillment in life. In the process world attempts to get the revelations of God in the terms and ways suited to the growth and development of each soul. The supreme is thus realized not through the words of human knowledge as his ideal position is that no number of good words can describe or explain him. He is that supreme form who is present everywhere through the dynamics of his presence in an invisible form. It is thus the real presence in the material context of the world by the aspirants of the world. as such that supreme abode, invisible in all respect, takes care of the real infuse of the divine world. Such a situation of the reality takes the spirit of the divine in the way that makes the life focused on the dynamics of the world. That is why he is beyond the perception of human being through the feeling of touch. It is that person of perception that attempts to attain the realization of God apart from having the scope to and the provisions of touch. He is beyond any perception through senses.

Aungushthah maatrah purushah madhyae aatmani tishthati.
Eishanoh Bhuta babyasya
Na tato bijugupsatae etatvai tat. (Kathopnishad 2-1-12)

Lord Supreme is the creator of all possessions of the world. It is as such known for its realistic perception in spiritual way. The spiritual way thus demands an inward seeking through the way of inner journey in the ways of the world. The perceptions that are earned through realization are attained through the ways of realization. This as such is the basis of the spiritual awakening of the persons in a way that reminds person to get into the dynamics of human progress. It is these dynamics that recounts to the power of human journey in the natural context of the world of humans. As such, the journey within is an outstanding perception dimension of the reality in the option of the world. The spiritual awakening thus would make things that makes people on earth to take care of their own dimensions and material gains in life. Sages have urged upon the individual persons to the scope of things and gain things as such from that. In this creation of gods, the human expectation would change and ultimately transform to a situation of realization. The supreme has to be known in spirit as the basis of gradual transformation in the making of a comprehensive life and focus of the life of a devotee. A devotee thus attempts to realize the supreme through the understanding of the ultimate reality. The first is actually one of the identities of the supreme and on the other hand it is the basis of the forward understanding of the supreme reality. He is also present as the *aatma* resides within the cave of the heart. Both the vast infinite and the supreme in the form of the smallest in the form of *aatma* reveals the same divine entity.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH **REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027**
1st December 2025 **Regn. No. WBBEN/2006/18733**
Agrahayan–1432
Vol. 23. No. 8 **Price : Rs. 5/-**

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৭ই ডিসেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.